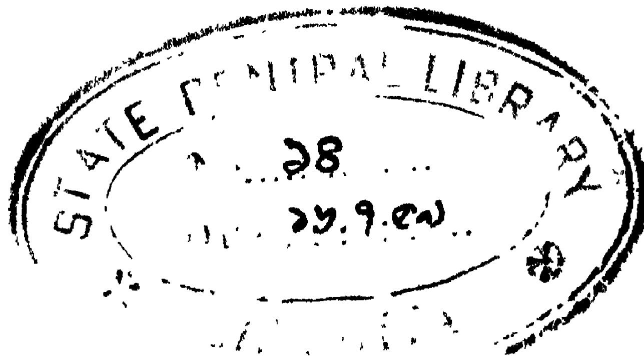
# জলাধারের অন্তরীক্ষ

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা—৬

প্রথম প্রকাশ—১৩৬০

মূল্য এক টাকা বার আনা মাত্র




৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা ৬, ডি এম লাইব্রেরীর পক্ষে শ্রীগোপালদাস মজুমদার
কর্তৃক প্রকাশিত। ৮৩বি বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা ৬, বাণী-শ্রী প্রেসের পক্ষে
শ্রীসুকুমার চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত।

# উৎসর্গ

জীবনে আদর্শ গৃহীরূপেই যাঁহাকে দেখিয়াছিলাম,
যাঁহার আশীর্ব্বাদ জীবস্তুরূপে আমাকে এ-সংসারে
আজও জীবিত রাখিয়াছে স্বর্গত সেই পিতামহ-
দেবের চরণে—

# জলাধারের অন্তরীক্ষ

# পাগলের পরিচয়

১

পাগল উপাধি এ সভ্যজগতে তাহারই হয়, যাহার বাক্যে ও কর্ম্মে সামঞ্জস্য থাকে না, বা যাহার কর্ম্মপদ্ধতি সাধারণত অনিয়মিত এবং পূর্ব্বাপর সম্বন্ধশূন্য। কিন্তু উন্মাদ যাহারা, স্বতন্ত্র তাহারা—চিকিৎ-সকের অধীনস্থ জীব।

নিখিলবন্ধুকে আমি পাগল জানিতাম। কারণ, তাহার কথা শুনিলে তাহাকে তাহাই মনে হইত, তবুও তাহার কথা মনোযোগ আকর্ষণ করিত, না শুনিলেও উপায় ছিল না। কথার সাধারণ সূত্রই চিন্তা, তাহার কথাগুলি যে সব চিন্তার ফল, সে চিন্তা ত সাধারণ মোটেই নয়, পরন্তু এতটা পরিমাণে অসাধারণ, যে তাহা বিশ্বাস করা ত দূরের কথা, শুনিতেই চিত্তে কেমন যেন একটা অস্থির ভাব আসে।

আমায় বন্ধু বলিয়াই বিশ্বাস করিত বলিয়া আমার কাছেই সে আসিত, বসিত, ধূমপান করিত, তাহার পুঁজিপাটা যা কিছু সকলগুলিই ঝাড়িয়া ফেলিত। সে সকল গ্রাহ্য হইল কি-না তাহা সে কখনও বিচার করিত না, বক্তব্যগুলি প্রকাশ করিয়াই খালাস। তাহার কোনও বন্ধন আছে বলিয়া আমি জানি না, কোথায় থাকিত তাহারও ঠিক ছিল না, তবে মধ্যে মধ্যে আসিত। ধীরে ধীরে, চিন্তায় জর্জ্জরিত স্থবিরের মত সে যখনই ঘরে প্রবেশ করিত, অনুমানে বুঝিতাম আজ কিছু নূতন বিস্ময়কর ব্যাপার বায়ুমণ্ডলের মধ্যে ছড়াইয়া দিবে, যাহাতে সবার প্রবহমান চিন্তাস্রোত ওলট-পালট হইয়া যাইবে। ইহার পর এখানে তাহার পরিচয় একটু দেওয়া ভাল।

ভূতত্ত্ব, জলতত্ত্ব, তেজস্তত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব, আকাশতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, প্রাচীন ইতিহাস, দেহতত্ত্ব ইত্যাদি আলোচনায় সকল তত্ত্বই কোন না কোনও

সময়ে তাহার মুখের কথায় রূপ পাইত। কেবল ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনও কথা কখনও তাহার মুখে শুনি নাই। একদিন সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—আচ্ছা, এত কথা বল, কিন্তু ভগবানের প্রসঙ্গে ত কিছু কোনদিনই বললে না—ও তত্ত্বটি তোমার বাদ পড়ল কেন,—এটা যে কেমন লাগে।

তাহাতে সে কোন প্রকার চিন্তা না করিয়াই বলিল,—যেমন আমার মুখে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনও কথা না শুনে তোমার কেমন কেমন লাগে আমারও ঠিক তেমনি ও বিষয়টা চিন্তা করতেই কেমন কেমন লাগে। শুনিয়া কৌতুকের বশে জিজ্ঞাসা করিলাম—কি রকম খুলে বল ত শুনি!

রকম আর কিছুই নয়, অন্য সব বিষয়ে চিন্তা করতে গেলে ভিতরে যে উৎসাহ বা আকর্ষণ অনুভব করি, ও বিষয়টি ভাবতে গেলে যেন বাধা আসে, সূত্র হারিয়ে ফেলি। জোর করে' স্বভাবের বিরুদ্ধে ত আর কিছু ভাবা যায় না।

আচ্ছা, পাঁচ জনের কাছে ঈশ্বর সম্বন্ধেও ত কিছু শুনেছ—তাতে কি মনে হয়!

সে ত পুরানো পুঁথি বা বইয়ের কথা এদিক ওদিক ক'রে বলা, না হয় শুনা কথা ফলিয়ে বলা, তাদের নিজের সে বিষয়ে কিছু প্রত্যক্ষ জ্ঞানও নেই, চিন্তাও নেই। যাক্ ও সব কথা না কওয়াই ভাল।

আরও একটু খোঁচা দিবার অভিপ্রায়েই বলিলাম—তা হোলে তুমি ঠিক একটি নাস্তিক, বল—হাঁ কি না।

শুনিবামাত্র সে যেন একটু চিন্তিত হইয়াছে এরূপ বোধ হইল, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাব কাটিয়া গেল, বলিল—হাঁ,—না।

শুনিয়া না হাসিয়া থাকিতে পরিলাম না, মুখে বলিলাম,—হাসালে বটে, এক কথায় বুঝি উত্তর দিতে বুদ্ধিতে কুলাল না!

সে বলিল,—তোমার যেমন কথা, তেমনি উত্তর। যখন ঈশ্বর-সম্বন্ধে

প্রত্যক্ষ জ্ঞান আর সেইজন্য বিশ্বাস না থাকার কথা ভাবি তখন নাস্তিক; কিন্তু আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকলেও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বাধে না, এটা যখন ভাবি এবং অন্তরে এটা বিশ্বাস করি তখন নাস্তিক নয়। এ ত সোজা কথা। যাক, ছেড়ে দাও না ও সব কথা।

ওর গায়ে কিছু লাগে না, সবই ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে। এ সম্বন্ধে আর ঘাঁটাইয়া কি হইবে যখন তার ইচ্ছা নাই। তবে একটা কথা আরও শুনিবার উদ্দেশ্যে আর একবার প্রশ্ন করিয়া বসিলাম, জানিতাম, সে কখনও তাহাতে রাগ করিবে না।

আচ্ছা, যখন এত লোকে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে কিছু পেয়েছে, তখন অবশ্যই তাঁর অস্তিত্ব আছে। আমি সাধারণের কথা বলছি না। এই ধর না, পৌরাণিক যা-কিছু না হয় ছেড়ে দিলে, কিন্তু বেদব্যাসকে ত উড়িয়ে দিতে পার না। তা সে যুগের বেদব্যাস থেকে শঙ্কর, রামানুজ, বল্লভাচার্য্য, মাধবাচার্য্য, চৈতন্য প্রভৃতি জন্মসিদ্ধ মহাপুরুষেরা আবার এ যুগের দেবেন্দ্রনাথ, কেশব সেন, রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ প্রভৃতি অসাধারণ মানুষদের কথাই বলেছি। আমাদের দেশের এঁরা যখন সাক্ষী—

বাধা দিয়া নিখিলবন্ধু জিজ্ঞাসা করিল, কিসের সাক্ষী?

ঈশ্বর আছেন তার সাক্ষী।

তাতে আমার কি? ঈশ্বর আছে কি নেই, এ যখন আমার মোকদ্দমা নয়, তখন তাঁরা সাক্ষী থাকেন, আছেন—না থাকেন, না আছেন—আমার মাথাব্যথা কিসের বল দেখি?

আহা, একেবারে উড়িয়ে দাও কেন। আমরা মানুষ, জগতের সভ্য সমাজে বাস করি, আমাদের সমাজের যে সব বড় বড় লোক, তাঁদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে দিয়ে যে অসাধারণ শক্তি, এবং ভাব-ধারার বিকাশ দেখিয়ে গেছেন, যা ধরে এক এক সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়ে গেল, তাঁদের ভাবের সঙ্গে পরিচয় না করলে চলবে কেন? তাঁরা যে বস্তু

নিয়ে জীবনটা কাটিয়ে গেলেন, আমরা চখের সুমুখে সেটা দেখবো না!

কে বারণ করেছে তোমায় দেখতে—সে সব ত তুমিও দেখছ, আমিও দেখছি।

বলি, তাঁরা ঈশ্বর-বস্তুকে অবলম্বন করে'ই না মহৎ হয়েছেন, আর তুমিও ত এটা দেখতে পাচ্চ, যেমন আমি পাচ্ছি!

যেমন তুমি দেখতে পাচ্চ, ঠিক তেমনি দেখতে আমিও পাচ্চি—এই কথা তুমি বলছ?

হাঁ, অন্তত ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে।

না, ও সম্বন্ধেও আমরা দুজনে একই বিষয় বা বস্তু দেখতে পাচ্চি না। তোমার কাছে হয়ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত; সেইজন্য তুমি ঈশ্বরকে অবলম্বন ক'রেই এই সকল লোকের অসাধারণত্ব, এটি দেখতে পাচ্চ, বিশ্বাস করছ—আমার তো তা হয় নি!

আচ্ছা, তুমি এ সকল ব্যক্তিকে অসাধারণ ব'লে স্বীকার কর কি-না!

আহা, তা করবো না কেন! তাঁরা সমাজের গড়পড়তা মানুষের তুলনায় কতটা বড়, সে আর বুঝতে পারি না! কি যে বল তুমি—আমায় পাগল ঠাওরালে, দেখছি!

আচ্ছা, সেই যে অসাধারণত্ব সেটি কিসের জন্য?

শক্তির জন্য, জ্ঞানের জন্য, নিজের ভিতর যে কর্ম্মশক্তি আছে, কোনও বিশিষ্ট ধারায় তা প্রসারিত হবার সুযোগ পাওয়ার জন্য। সেই জ্ঞানকে অবলম্বন ক'রে যে সব কর্ম্ম করেছেন, তাতে একশ্রেণীর মানুষ সুখী হয়েছে, তাতে তাদের আনন্দের স্ফুরণ ও ভাবের প্রসার হয়েছে সেই জন্য।

তা হলেই এটা ত বুঝতে পারা যায় যে, শক্তি, জ্ঞান ও আনন্দের স্ফুরণ ঈশ্বরকে অবলম্বন না করলে আসবে কি করে! তাঁরা

প্রত্যেকেই ঈশ্বরকে অবলম্বন করেছিলেন বলেই না এতটা জ্ঞান ও আনন্দের এবং একটি বিরাট জনসমষ্টির শ্রদ্ধার অধিকারী হয়েছিলেন ?

একথা ত আমি বুঝতে পারি না—যে, ঈশ্বরকে অবলম্বন করেছিলো ব'লেই জ্ঞান, আনন্দ কিম্বা জনসমাজের শ্রদ্ধার অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক ভাব বা বস্তু লক্ষ্য করেছিলেন—এইটিই বরং বেশী বেশী দেখ্‌তে পাই। ঈশ্বর ব'লে কোন বস্তুর অস্তিত্ব আমি এর মধ্যে দেখতে তো পাই নি।

প্রত্যেকে আলাদা বস্তু লক্ষ্য করেছিলেন—আর সে বস্তু ঈশ্বর নয়, এই কথা তুমি বলছ ?

হাঁ তাই-ই ; আমি আর কিছু বুঝিনি বা বলিনি—ছেড়ে দাও না ও সব, যার ভিতরে আমার মাথা যায় না।

তা বললে হবে না, তুমি ত এদের কথা আলোচনা করেছ। আচ্ছা, বল দেখি, বেদব্যাস ভগবান সম্বন্ধে কি অদ্ভুত স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ ভাবেই বলেছেন।

গোড়ায় বেদব্যাসের দায়িত্বই এ ব্যাপারে খুব বেশী এ কথা ঠিক, কিন্তু তাঁর অপূর্ব্ব কাব্য সৃষ্টিকে নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করবার ত কোনও প্রয়োজন আছে বোলে আমি মনে করি না। তারপর তাঁর অন্যান্য মতও আমার অভ্রান্ত ব'লে মেনে নিতে প্রাণ যদি বা না চায়, ত জোর করে মানাতে পার কি ? আমার প্রাণ যে চায় না।

আচ্ছা, তারপর শঙ্কর—এত বড় আচার্য্য মহাপুরুষ।

সেই ত পুরানো কথা নিয়েই তাঁর কারবার—

কি রকম ?

উপনিষদের আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব সেই পুরাতন কথা নিয়ে আলোচনা নয় কি ? উপরন্তু জোর করে মায়া বা বিবর্ত্তবাদের প্রতিষ্ঠা নিয়েই ত শঙ্করের যত বাদানুবাদ ! যা আমি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মেনে নিতে পারি না।

আর রামানুজ! তাঁর যা-কিছু—বিশিষ্টাদ্বৈত মতের বাদানুবাদ নয় কি? জীব আর ঈশ্বরে পার্থক্য—বিরাট আর অংশ, অমন অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, তাতে কি?

মাধবাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য, চৈতন্য প্রভৃতি।

তাঁদেরও ত ঐ দ্বৈতাদ্বৈত শুদ্ধাদ্বৈতবাদ আর অচিন্ত ভেদাভেদ নিয়ে ও প্রেম ভক্তির ধারা, পাঁচ জনের মধ্যে শক্তিসঞ্চার আর নিজ নিজ জীবনে আনন্দ লাভ—অবশ্য সেটা ব্যাপক ভাবে।

আচ্ছা, এ যুগের মানুষ, ধর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব সেন!

দু'জনের ত এক মত নয়! দেবেন্দ্রনাথের সেই পুরানো উপনিষদের, ব্রহ্ম আর মহানির্ব্বাণতন্ত্রের বাছা বাছা শব্দ ও স্তোত্রপাঠ আর সগুণ জ্যোতির্ম্ময়ের উপাসনার জাঁকজমক। সূর্য্যোপাসনাও তাঁর ছিল তাও জানি। আর কেশব সেনের ত আলাদা বিধানই হয়ে গেল।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ?

ওঁরাও ত দুজনে আলাদা, রামকৃষ্ণের মত বা সিদ্ধান্ত সবই ত ভাব-রাজ্যের ব্যাপার; তাঁর কর্ম্মজীবন একরকম, বিবেকানন্দের একেবারেই আলাদা। তাঁর আগা পাসতলাই কর্ম্মরাজ্যের। এসব ত তুমিও বুঝতে পার, আমিও বুঝতে পারি—নিজ নিজ বুদ্ধির মত করে' নিয়ে অবশ্য।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর?

সেও ত মাধবাচার্য্য, ও চৈতন্যের অনুসরণ।

আচ্ছা, অরবিন্দ?

আত্ম-চৈতন্যের স্ফুরণ, তাঁর মধ্যে সকলেই স্বীকার করবে—বাকীটা ত শক্তিকে অবলম্বন করে কর্ম্মজগতের মধ্যে তাতে আত্মসমর্পণ।

তা হ'লে এই যে যে সব মহাপুরুষের কথা আমরা পাচ্ছি, তাঁদের লক্ষ্যই এক ঈশ্বরবস্তু কি না, কর্ম্ম অবশ্য বিভিন্ন হতে পারে!

তাঁদের লক্ষ্য ত এক নয়ই, বরঞ্চ কর্ম্ম তাঁদের সকলেরই এক বলতে পারো। তাঁদের আশপাশের সকলকে যজানো, আর সেই কাজটি সুসিদ্ধ করবার জন্য শক্তিলাভের চেষ্টা বা সাধনা ছাড়া অন্য কর্ম্ম ত দেখতে পাই না।

আচ্ছা, তাঁদের জ্ঞান, ভক্তি, শক্তি, আনন্দ—এগুলি ত সকলকার একই ?

সরলভাবে বিচার করলে সেগুলি গুণগত ভাবে এক—তাতে কি এলো গেল! কর্ম্মের ফলে জ্ঞানও লাভ করা যায়, ভক্তি বা ভাবও পাওয়া যায়, শক্তিও পাওয়া যায়, শেষে আনন্দও পাওয়া যায়। শক্তি থাকলে যাকেই ছোঁবে তাইতেই ত সংক্রামিত হবে।

সত্যবস্তুকে অবলম্বন করতে পারলে তবেই না,—

যে যেটা ধ'রে থাকে সত্য ব'লেই ধরে না কি ?

যদি বলি জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দই ঈশ্বর—

তা সে তো অল্প-বেশী নানা মাত্রায় সকলকার মধ্যেই রয়েছে। কই, তাতে তো ঈশ্বর বলে আলাদা একটি কিছু অনুভূত হয় না।

হোপলেস্—তুমি ঈশ্বর বলে' বা ভগবান বলে' তা'হলে কিছুই মান না ?

নির্ব্বিচার সংস্কার-বশে ভগবান ব'লে একটা শব্দময় ফাঁকা ভাব ছেলেবেলা থেকে মাঝে মাঝে মনের মধ্যে আসে বটে ; কিন্তু বুঝতে গেলে তার কোনও হদিশ পাই নি, কেউ পেয়েছে বলে'ও শুনি নি। তারপর তোমার যা বিশ্বাস। আর ওসব কথায় কাজ নেই।

কেন ভগবানকে পেয়েছেন বা জেনেছেন—এ কথাও ত রামকৃষ্ণের মত মহাপুরুষদের জীবনে—

শব্দটা ঐ রকম শোনায় বটে ; কিন্তু ভাবের বা বস্তু-নির্দ্দেশের বেলা সেই নিজের সত্তায় প্রতিফলিত জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের উপরে এনে ফেলেছেন।

তা হলে' কি জগৎ জুড়ে যত ধর্ম্ম, ঈশ্বর ব'লে এই অধিকাংশ জনসমষ্টি বিশ্বব্যাপী চৈতন্যময় একসত্তার প্রতি লক্ষ্য করছে সেটা কি ভ্রম বলতে চাও ?

জনসমষ্টি মিলিত হয়ে যখন কোন কাজ করে, তখন কি তাকে ভ্রম বলা যায় ? আমার কথা ধর কেন ভাই, আমি এই বুঝি—আমাদের যে সত্তা, তার জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের বিকাশের তারতম্যেই ছোট-বড় আমাদের বিচারে সাব্যস্ত হয়। গুরুভাব অর্থাৎ মানুষ হয়ে মানুষের উপর আধিপত্যই হল এখানকার চরম ভোগ :—তা রাষ্ট্র ব্যাপারেই হোক, কোন কর্ম্ম বা ধর্ম্ম ব্যাপারেই হোক, অধ্যাত্ম জ্ঞান বুদ্ধি, বিজ্ঞানের ব্যাপারেই হোক। কেন্দ্রস্থ সত্তা যে বস্তু বা বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হবে, তাকেই মহাপ্রসারিত ক'রে তুলবে—যার ফল সমধর্ম্মী।' অন্যান্য সত্তার আকৃষ্ট হওয়া, শক্তির স্ফুরণ হওয়া ; আর এই সকল প্রত্যক্ষ অনুভব বা দর্শনে আনন্দে ভাসা আর দোল খাওয়া।

মাপ কর ভাই—আর ঈশ্বরের কথায় কাজ নেই।

২

আজ নিখিলবন্ধুর পালা, আমি চুপচাপ।

নিখিল বলিতে লাগিল,—শুনচো একটা ব্যাপার ?

বল না শুনচি।

পুরী সমুদ্রের তীরে বসিয়া আছি, এক অমাবস্যার রাত্র। দেখিলাম আকাশে মেঘ নাই, অনেকগুলি উজ্জ্বল তারা দেখা যাইতেছে। বায়ু স্থির, হঠাৎ ঝড়ের মত একটি দমকা বাতাস উঠিল। সেই বাতাসের গতি উত্তর হইতে দক্ষিণের দিকে, এমনই মনে হইল। গ্রাহ্য না করিয়াই বসিয়া আছি। লক্ষ্য রহিয়াছে সমুদ্রের জলের দিকে, তরঙ্গের রঙ্গ-ভঙ্গ চলিতেছে। যেমন তরঙ্গ সাধারণত সমুদ্রের তীরের দিকে থাকে, সেইরূপ তরঙ্গেরই খেলা ; অন্ধকারও ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে। সমুদ্রতীর এখন প্রায় নির্জ্জন, দূরে ক্বচিৎ দুই-একজন চলাফেরা করিতেছে।

বালুময় তীরভূমির অতি নিকটেই, জলরেখার কতকটা দূরে, চঞ্চল জলের উপর যেন জোনাকির গাঁদি লাগিয়াছে। একটি তরঙ্গ আগাগোড়াই জ্যোতিষ্মান্, তারপর সেইরূপ একটি, তারপর আর একটি। তিনটি পর পর আসিয়া যখন সৈকতের বালুতলে মিলাইয়া গেল তখন দেখিলাম,—চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারার ছড়াছড়ি ; তাহার মাঝে একখানি শ্বেতবর্ণ প্রায়-চতুষ্কোণ পদার্থ, যেন একখানি স্থূল কাষ্ঠাসন, তাহার উপরে গোলাকার একটি পদার্থ। অন্তরে দীপ্ত কৌতূহল, সুতরাং অনুমান করিতে কল্পনার প্রশ্রয় না দিয়াই উঠিলাম। জল হইতে সেটি যখন সৈকতের নিকটে আসিয়াছে, তখন নিকটে যাওয়া কঠিন নয়। তাহার নিকটে গিয়া হেঁট হইয়া পরীক্ষায় মন দিয়াছি, এটি কোন্ পদার্থ! হঠাৎ যেন ঝড়ের সঙ্গে একজন কেহ পশ্চাৎ

হইতে একটি ধাক্কা দিয়া আমায় তাহার উপর ফেলিয়া দিল। আমার কোন আঘাত লাগিল না; কিন্তু তাল সামলাইয়া উঠিবার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই আর একটি ধাক্কার আমায় তাহার উপর বসাইয়া দিল—সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশাল তরঙ্গ আসিয়া সেই আসনশুদ্ধ আমাকে ভাসাইয়া জলের দিকে লইয়া চলিল। সত্যই একটু ভয় পাইলাম। কি করিব, না করিব, বিচারে ঠিক করিবার অবকাশও পাইলাম না। দেখিলাম—সেই আসন আপনবেগে ক্রমাগত গভীর জলের দিকেই চলিল।

স্বপ্নাবিষ্টের মতই দেখিতেছি,—এতক্ষণ যেন তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই চলিতেছিলাম, কিন্তু তীর হইতে যখন গভীর জলে প্রায় চার শত গজ দূরে আসিয়াছি, তখন আর একটি বিশালায়ত প্রবল তরঙ্গ আসিয়া সেই আসনকে বায়ুবেগে পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণের দিকে লইয়া চলিল। তখন আমি নিরুপায় হইয়া, পা গুটাইয়া স্থির হইয়াই সেই আসনে বসিলাম।

ঘোর অন্ধকার রাত্রি। জলের উপর মাঝে মাঝে তরঙ্গের তুষার-ধবল পুঞ্জীকৃত ফেনরাশি মধ্যে মধ্যে আমার চক্ষে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। ভাবিলাম, এখনও জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলে বোধ হয় সাঁতার দিয়া কোনও রকমে তীরে উঠিতে পারিব; কিন্তু আসনের সঙ্গে যেন এমনভাবে বাঁধিয়া দিয়াছে, যাহাতে নড়িবার সাধ্য নাই—সুতরাং হাল ছাড়িয়াই দিলাম। ভয় যথেষ্টই আছে; কিন্তু যেন তারও উপরে। তখন এতটা বিস্মিত হইয়াছি, আমার সবটুকু অস্তিত্ব যেন সেই বিস্ময়ের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে। কি হইল? এটা তো দৈব ব্যাপার।

এদিকে আসন ক্রমশ তীরের সম্পর্ক ছাড়াইল, আর পশ্চাতে ফিরিয়া তীরের চিহ্নও দেখিতে পাইতেছি না, কেবল একটি ক্ষুদ্র তারার মত লাইটহাউসের আলোটুকু নড়িতেছে। আসনের গতি ক্রমশই বাড়িতেছে। কানে হাওয়া ঢুকিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে; বোঁ বোঁ

শব্দ অবিরাম, আর কোনও শব্দ নাই। কি উপায় হইবে, অভ্যাস-বশত মনে মনেই একবার শব্দ হইল—হা ভগবান!

আসনটি, আগাগোড়াই দেখিতেছি অদ্ভুত, কাঠের একখানি পিঁড়া জলে ভাসাইলে যেমন দোলে, অসমান ভারে যেমন এ-দিক ও-দিক উঁচুনীচু হয়, এই অপূর্ব্ব আসন সেভাবে কোনও দিকেই তিলমাত্র হেলিতেছে অথবা দুলিতেছে না, ঠিক সমানভাবেই রহিয়াছে, যেন সমতল ক্ষেত্রে স্থির বসিয়া আছি। আমি একটু এ-দিক ও-দিক করিলে বা চঞ্চল হইলেও সে আসন অচঞ্চল, স্থির। প্রথম হইতেই এটা লক্ষ্য করিয়া আমি আরও আশ্চর্য্য হইয়াছি। কি বস্তুটি ইহা! কাঠও নয়, পাথরও নয়, এদিকে খুব পুরু—আমার অঙ্গুলির প্রায় দুই পর্ব্ব হইবে, কোণ চারিটাই গোলাকার। ঝিনুকের ভিতর পিটের মত উপরটি তাহার উজ্জ্বল এবং মসৃণ, কেবলমাত্র এইটুকু অনুভব করিতে পারিলাম। কতক্ষণ এই আসনের উপর বসিয়া চলিয়াছি, মনে নাই; ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ যেন এক হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ বুঝিতে পারিলাম, যেন আসনের গতি অনেকটা মৃদু হইয়া গিয়াছে। তখন কল্পনা করিতেছিলাম—এইভাবে চলিতে চলিতে ক্রমে এবার আসনটি কোথাও হয়ত স্থির হইয়া যাইবে।

ঘটিলও তাই, কিন্তু কি আশ্চর্য্য তার গতির নিয়ন্ত্রণ। ঠিক এটি মনুষ্যচালিত কোনও যন্ত্রের মত ব্যাপার নয়, একেবারেই দৈবগতি তার, যে ক্রমে কমিতে লাগিল তাহা আমার ধারণার অতীত। সে আসন থামিতে থামিতে প্রায় দুই দণ্ডের উপর চলিল। বায়ুও এখন ঠিক আসনের গতির সঙ্গে মিলিত, ক্রমে একেবারেই নিস্তব্ধ, অন্ধকারের মাঝে যেন আসনখানি স্থির, গতিহীন হইল।

আমার অবস্থা এখন বর্ণনার অতীত। অসীম জলতলের চারিদিকেই অন্ধকার বটে কিন্তু আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের আলো; সেই আলোতে, সম্মুখে, সমুদ্রের জল-বিস্তৃতির কতকটুকু লক্ষ্য হয় মাত্র, বাকী সবটুকুই

ক্রমে তরল অন্ধকারে মিলাইয়া গিয়াছে। কি অপূর্ব্ব শূন্যতা, তার মধ্যে আমি একমাত্র জীব। ভয় আর বিস্ময়—এই দুইটি ঘনীভূত ভাবেই আমার অস্তিত্বের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে—আমি সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থবর্জ্জিত একটি জীবমাত্র!

অকস্মাৎ একটি শব্দ যেন কানে আসিল। শব্দটা জলের নয়, যদিও জলের মধ্যে আমি রহিয়াছি। বীণাতে ষড়জের তারে জোরে ঘা দিলে যেমন ধ্বনি উঠে, এ শব্দ সেইরূপই অনুভব করিলাম। স্তম্ভিত অবস্থাতেই আসনে ছিলাম, এই আকস্মিক শব্দে যেন চমকিত হইলাম। কোন একটি দিক হইতে শব্দ আসে নাই, ঠিক আমার মাথার অনেকটা উপর আকাশ হইতেই এই শব্দ উঠিয়া ক্রমে ক্রমে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে মণ্ডলাকারে দিগন্তে মিলাইয়া গেল; চমকের রেশও সেই সঙ্গে ক্ষীণ হইয়া গেল। শব্দটি যেখানে অনুমান করিয়াছিলাম, সেইখানেই আবার অপ্রত্যাশিত একটি ব্যাপার যাহা ঘটিল, তাহার প্রভাবও আমার মধ্যে কিছু কম হইল না।

দেখিলাম, অনেকটা ঊর্দ্ধে, আকাশের কতকটা স্থান মণ্ডলাকারে আলোকিত। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ জ্যোতি, তারও কেন্দ্র ঠিক আমার মাথার উপরে বহু ঊর্দ্ধে আকাশে, অনুমান হইল যেস্থান হইতে ধ্বনি উঠিয়াছিল, ঠিক সেইখানেই জ্যোতিরও কেন্দ্র। কেন্দ্রস্থিত কতকটা ছায়া, যাহা কৃষ্ণবর্ণ গাঢ় অন্ধকারময়, মণ্ডলাকার সেইস্থান হইতেই জ্যোতির বিস্তার। সেই অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রথমে ঘনীভূত হইয়া, পরে তরল হইয়া ক্রমশ দিগন্তে বিলীন হইয়াছে। সেই নয়নাভিরাম জ্যোতির্দ্দর্শনে আমার অন্তরের যত ভয়, যতটা সঙ্কোচ, যত কিছু অশান্তির ছায়া একেবারেই চলিয়া গেল আর আমার অন্তরক্ষেত্রও যেন জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিল। একি অপূর্ব্ব ব্যাপার, যেন সমস্তটুকু জীবন দিয়াই এই অপার্থিব আনন্দরস গভীরভাবে আস্বাদন করিলাম! কিন্তু সে আনন্দ আমার বেশীক্ষণ ভোগ হইল

না; কারণ ক্রমে ক্রমে অল্প সময়ের মধ্যেই উহা ম্লান হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরের জ্যোতিও ম্লান হইতে লাগিল, কেমন একটা নিরানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। তবে আর আমার ভয় রহিল না। কিন্তু তারপর ক্রমে যেন আমার এই সন্দেহ উপস্থিত হইল—যথার্থই কি জ্যোতি দর্শন করিলাম, না অন্ধকার রাজত্বে জ্যোতির মরীচিকা দেখিলাম! স্বপ্নাবিষ্টের মত হইয়া গিয়াছি, আমার যেন কোন বস্তু নির্দ্ধারণের শক্তি নাই। যাহা প্রত্যক্ষ দেখিলাম, তাহাতেও আমার সন্দেহ হইতে লাগিল।

এই দুর্ব্বল তন্দ্রাময় অবস্থা যে আমার কতক্ষণ ছিল, মনে নাই। ক্রমে ক্রমে মৃদুমন্দ সমীরণস্পর্শে যেন আবার আমি একটু সচেতন হইলাম। কি প্রাণমুগ্ধকর গন্ধ এই মৃদু-পবনে ভাসিয়া আসিতেছে! এমন গন্ধ জীবনে কখনও অনুভব করি নাই। উহার একটা উন্মাদনা আছে—যতই সেই গন্ধপূর্ণ বায়ুতে শ্বাস লইতে লাগিলাম, এক প্রকার নেশায় মন প্রাণ আমার স্থির হইয়া যাইতে লাগিল—ক্রমে আমি আসনে বসিয়াই যেন অচৈতন্য হইতে লাগিলাম। বাহ্যজ্ঞান একেবারেই যে লোপ পাইল, তাহা বলিতে পারি না; কারণ তখনও শরীরে পবনের স্পর্শ অনুভূত হইতেছিল; সেই গন্ধের রেশও প্রাণে অনুভব করিতেছিলাম, তবে ক্রমশই যেন ক্ষীণ হইয়াই আসিতেছে। বেশ বুঝিতে পারিলাম, ঐ গন্ধের মধ্যে এমন একটা মাদকতা আছে, যাহাতে আমার ঐরূপ অবস্থা ঘটিতেছে। ক্রমে আমার স্মৃতিলোপ হইল, ঠিক যেন সুপ্ত হইয়া পড়িয়াছি।

কতক্ষণ পর যেন আবার একটি স্বপ্নময় অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইল, আমি যেন কোন শান্তিময় অবস্থা হইতে জাগ্রত হইতেছি, এমনই ভাবটি। তখন দেখিলাম—তমসাবৃত রাত্রির আঁধার যেন ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কিম্বা সূর্য্যাস্তের পরে প্রদোষকালে যেমন মেঘমুক্ত আকাশে আলো থাকে। বেশ দেখিতে

পাইতেছি, সে স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আলোতে তীব্র ভাব নাই; অথচ সকল বস্তুই স্পষ্টভাবে দেখা যায়, ক্রমে ক্রমে এমনই আলোকে দিক সকল পূর্ণ হইল, তখন দেখিলাম—সমুদ্রটি নিস্তরঙ্গ, বায়ু গতিশূন্য অবস্থায় পুষ্করিণীর জল যেমন স্থির থাকে, তেমনই স্থির। সেই স্থির জলরাশির অনন্ত বিস্তৃতির উপর অপূর্ব্ব দৃশ্য! অসংখ্য উজ্জ্বল আভাময় দীর্ঘ শরীর সকল ইতস্তত গতিমান। শরীর ত বটে! অনেকক্ষণ স্থিরভাবে নিরীক্ষণ করিয়া কৃতনিশ্চয় হইলাম। শরীর ব্যতীত আর কি বলিব।

এ শরীর আশ্চর্য্য রকমের; মানুষের মত রক্ত-মাংস-অস্থি নির্ম্মিত নয়; আমাদের শরীরে যেমন স্থূলতা ও গুরুত্ব আছে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেদে বিভিন্ন আকারের অস্থি মাংসপেশীসমূহের উপর স্থূল চর্ম্ম আচ্ছাদনে মিলিত একটা আকারের সঙ্গে নানা প্রকার বর্ণ, তাহার উপর বস্ত্রাদির আচ্ছাদন আছে, এখানে ইহারা সেরূপ নয়—আকৃতি দীর্ঘ এবং বর্ণ স্বচ্ছ নীলাভ। শরীর মধ্যে হস্ত-পদাদি অঙ্গের সংস্রব নাই। একটি মানুষের শরীর যদি সোজা হইয়া দাঁড়ায়, হাত দুটি সোজা-ফেলিয়া রাখিলে মেরুদণ্ডের মূল লইয়া যে আকৃতি হয়, তাহাদের আকৃতি অনেকটাই সেইরূপ। মানুষের শরীরের আকৃতি যেমন স্পষ্ট রেখায় নির্দ্দেশ করা যায়, তাহাদের বাহ্য আকৃতি সেইরূপ হইলেও স্পষ্ট রেখায় নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না—যেন শেষের দিকে সীমা-রেখা ক্রমে ক্রমে তরল বাষ্পাকারে মিলাইয়া গিয়াছে। মানুষের আকার যতটা দীর্ঘ, তাহাদের শরীর দৈর্ঘ্যে তাহাপেক্ষা অনেকটাই কম, নিম্নাংশ ক্রমে সরু হইয়া শেষ হইয়াছে। অসীম জলের বিস্তার সেখানে তুলনা করিবার মত কোন বস্তু না থাকায়, প্রথমে ততটা লক্ষ্য হয় না।

সেই সকল শরীর নিঃশব্দে, নিস্তরঙ্গ জলের উপর নড়াচড়া করিতেছে। মুণ্ডের আকৃতি তাহাদের আছে; কিন্তু তাহার মধ্যে কেশ, কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা, মুখ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের কোন চিহ্নই নাই।

মানুষের যেমন গলা শরীর ও মুণ্ডের সংযোগস্থল, তাহাদের গলা নাই—মুণ্ডের সঙ্গেই শরীরের আকৃতি নামিয়া আসিয়াছে, পায়ের দিকটা যেন মিলাইয়া গিয়াছে। তাহাদের গতি বিচিত্র ধীরে ধীরে সরিতেছে বোধ হয়। কোথাও চাঞ্চল্যের লেশ মাত্র নাই বা পরস্পর বাক্যবিনিময়ের শব্দ নাই।

ক্রমে ক্রমে সেই সকল আকৃতিগুলি আমার সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল; অপূর্ব্ব বিস্ময়ে অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে আরও অনেক কিছু তাহাদের শরীরে দেখিতে পাইলাম—ঐ নীলাভ বলিয়া প্রথমে যাহা দেখিয়াছিলাম তাহার মধ্যেও নানা বর্ণের আভা আছে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়। কোনটিতে পীত বর্ণের আভা, কোনটি গোলাপী, কোনটি সিন্দূর বর্ণের, কোনটিতে পিঙ্গল, কোনটিতে বেগুনী, কোনটি বা হরিৎ—এইরূপ এক একটি বিশিষ্ট বর্ণের ঘনীভূত আভায় যেন সকল শরীরই নির্ম্মিত হইয়াছে।

প্রথম দৃষ্টিতে তাহা লক্ষ্য হয় না, বলিয়াছি, যেন সকলকার একই বর্ণের আভা, কোনও বৈশিষ্ট্য নাই। আমরা যেমন চক্ষুর দৃষ্টিতে সম্মুখে দেখিয়া চলি এবং ফিরিবার সময়ে শরীরকে ঘুরাইয়া তবে ফিরিয়া আসি অর্থাৎ প্রত্যেক কর্ম্মটি শরীরকে ফিরাইয়া, দৃষ্টি সম্মুখে রাখিয়া সম্পন্ন করিতে হয়, তাহাদের তাহা নয়। তাহাদের গতির সঙ্গে শরীরকে ফিরাইতে হয় না। একটি শরীর একদিকে অগ্রসর হইল, ফিরিবার সময় শরীরকে না ফিরাইয়াই আবার সেই দিকে আসিতে লাগিল। সম্মুখে পশ্চাতে, দুই পার্শ্বে, যেদিকেই হোক না কেন, তাহাদের গতি শরীরকে না ফিরাইয়াই সম্পন্ন হয়। অপূর্ব্ব ব্যাপার—যেন তাহাদের সকল দিকেই চক্ষু অথচ চক্ষু বলিয়া কোন ইন্দ্রিয়ের লক্ষণই নাই। সুতরাং তাহাদের মানুষ বলিব কিম্বা আর কিছু বলিব, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। যাহাদের শরীর নাই অথচ শরীরের আকার এবং স্বচ্ছভাবের নানা বর্ণের আভা আছে,

গতি আছে অথচ আয়াস নাই—এমন বস্তুকে কি বলা যায়! মানুষের সঙ্গে তার তুলনা কোথায়? তাহারা চেতনাময় প্রাণী বা জীব, এটা ঠিক; কিন্তু কি বলিব তাহাদের!

দেখিলাম, তাহাদের ঊর্দ্ধগতিও আছে। তবে সেই গতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের তরল লঘু শরীর যেন আরও তরল হইয়া মিলাইয়া যায়। আমি ভাবিতেছিলাম যে, স্থলের জীব, একটি স্থূল শরীর বিশিষ্ট প্রাণী, মানুষ আমি, চক্ষের সম্মুখে এ কি দেখিতেছি। এখন অপূর্ব্ব ব্যাপার। সেই আসনে বসিয়া,—এ কি, কোথায় সে আসন! কোথায় আমার রক্ত-মাংস-অস্থি-হাত-পা সংযুক্ত শরীর? কই, আমার সে শরীর তো নাই, এত লঘু যেন কোনও ভারই নাই, বায়ুর মত লঘু হইয়া গিয়াছি। কোথায় আমার হাত, পা, চোখ, মুখ, নাক, কান? আমার মুণ্ডই বা কোথায়? আমি ঘাড় না ফিরাইয়াই সকল দিকই দেখিতে পাইতেছি। আমার মুণ্ডের স্থানে এক অপূর্ব্ব অনুভূতি যাহা স্থূল শরীরে হৃদয়ে অনুভব করিতাম। আমার এখন সবটাই চক্ষু, সবটাই কান, সবটাই নাক, সবটাই স্পর্শ।

চিন্তার কোন অবসর নাই, এ রাজ্য পৃথিবীর জীবের অগোচর। যাহাকে আমরা লবণ-সমুদ্র বলিয়া জানিতাম, যাহার উপরে আকাশ, নীচে নানাবিধ অসংখ্য জলজীবপূর্ণ সমুদ্রজল, সেই জলাধারের উপর এক অসীম, উন্নত জীবরাজ্য—যাহা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, যাহার কথা কখনও শুনি নাই!

স্থলরাজ্যে যেমন বৃক্ষলতাপূর্ণ বিস্তীর্ণ ভূমিতে আমরা নানাপ্রকারের স্থূল শরীর লইয়া নানা জাতীয় মানুষ, পশু পক্ষী সরীসৃপ উদ্ভিদ বাস করি, বিশাল এই সমুদ্রজলের উপর-তলে, তরল আধারের উপযুক্ত শরীর লইয়া এখানে কেবল মাত্র উন্নততর সূক্ষ্ম বর্ণময় শরীরধারী উচ্চশ্রেণীর জীব বাস করে। সমতল ভূমিতে বা প্রস্তরপূর্ণ কঠিন পর্ব্বতভূমির উপর নানা জাতীয় মানুষ আমরা, দেশের জীবসকল কত

ভাবে মনোমত উপাদান সংগ্রহ করিয়া যেমন নিজ নিজ বাসস্থান নির্ম্মাণ করি, এখানে সেরূপ স্থূল জীবও নাই, আর কোন প্রকার বাসস্থান বলিয়া কিছু চিহ্ন কোথাও দেখিতেছি না। দেশের কঠিন মাটির উপর আমরা সভ্যতা-গর্ব্বিত জীবসকল নানাভাবে পরস্পর সম্বন্ধ পাতাইয়া, যানবাহনাদি লইয়া কত কত হাবভাব ভঙ্গীতে যাতায়াত করি, বিচিত্র কোলাহলময় অশেষবিধ কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, নানা প্রকার দ্বন্দ্বময় অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি, এখানে তাহার কিছুই নাই। এখানকার অধিবাসীরা সূক্ষ্ম আভাময় শরীরে নিঃশব্দে এক বিশাল কর্ম্মরাজ্যে বিচরণ করিতেছে, সর্ব্বপ্রকারেই স্থূলভূতের সম্পর্কশূন্য হইয়া এক মহান উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত—যাহার খবর বুদ্ধিগর্ব্বে স্ফীত উন্নত মস্তক সভ্য মানবসমাজের গোচর নহে।

কঠিন ভূপৃষ্ঠবাসী জীব সকলের মধ্যে যেমন জীবসৃষ্টির সূত্রে একটা উন্মাদ তৃষ্ণা বা মোহ, উদ্দাম সম্ভোগেচ্ছা অবিরাম কর্ম্ম প্রেরণা দিতেছে, তাহার ফলে জন্ম ও মৃত্যুর লীলা, নানাপ্রকার ব্যাধি বহুবিধ অশান্তি, সদাচার কদাচার অবিরাম মানুষ-সমাজকে আলোড়িত করিতেছে ; এখানে সে সকল সম্ভোগের কোন আভাস নাই, আর জন্ম-মৃত্যুর ব্যাপারও নাই। যতটুকু বুঝিলাম, এখানে কেহ জন্মগ্রহণ করে না। এখানকার জীবগণ আমাদের মত কোন স্থূললোক হইতে উৎকৃষ্ট বা উন্নত কর্ম্মফলেই আসিয়া থাকে।

যেইমাত্র দেখিলাম, আমার মানুষের শরীর নাই, আমার সেই ঘন, আভাময় শরীরের মধ্যে একটি আনন্দের প্রবাহ খেলিয়া গেল, যেন পর পর তাড়িৎশক্তির দুই-তিনটি তরঙ্গ, বেশ বুঝিতে পারিলাম শরীরের উপর দিয়া চলিয়া গেল। আমার চারিদিকেই সেই আভাময় শরীর সকল নিজ নিজ ভাবে বিভোর, আপনাতে আপনি সমাহিত হইয়া অজ্ঞাত কোন কর্ম্মের মধ্যে অভিনিবিষ্ট। সে কর্ম্মের কথা পরে বলিতেছি।

*

এখন আমার এই রূপান্তর, এই অভাবনীয় ভিন্নলোকে আগমন ও অবস্থান, আমাকে যেন সত্তায় পর্য্যন্ত পৃথক করিয়া দিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের স্ফুরণ হইতেছে! কোন্ পুণ্যফলে আমার সজ্ঞানে এই অবস্থা ঘটিল, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। ক্রমে দেখিলাম, আলোকে দিঙ্মণ্ডল আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে অতীব সূক্ষ্ম, মধুর সুরের আভাস সেই আলোক-রশ্মির সঙ্গে সঙ্গে আমার ব্যাপ্ত শ্রবণ পূর্ণ হইতে লাগিল। সূক্ষ্ম তারের যন্ত্রের ঝঙ্কারের সঙ্গে তুলনা করিলে ঠিক হয় না ; কারণ তাহার রেশ অতীব সূক্ষ্ম ও মৃদু ; এই

সুরের রেশ অবিরাম, অতীব তীক্ষ্ণ, এবং পুনঃ পুনঃ অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঝঙ্কারে উদ্ভাসিত। সে সূক্ষ্ম সুর সূর্য্যকিরণ বা রশ্মির সঙ্গে সংযুক্ত, তার ঝঙ্কার-মাধুর্য্য বর্ণনার ভাষা নাই। স্থূল শব্দের মধ্যে এমন শক্তি নাই, যাহার সাহায্যে সেই অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সুরধ্বনির কতকাংশও বর্ণনা করা যায়। পার্থিব যন্ত্রধ্বনি এতই স্থূল, তাহার সঙ্গে তুলনা করা বিড়ম্বনা। আমাদের কান কেবল স্থূল শব্দই গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত বলিয়াছি—এই অপার্থিব সূক্ষ্ম-ধ্বনি গ্রহণ করিবার যোগ্যতা কোথায়? মাত্র এইটুকু বলা যায় যে, ইহা অপূর্ব্ব বিস্ময়কর এবং আনন্দময়।

ক্রমে দেখিতেছি, আলো আর সুর একযোগে রশ্মির আকারে, অনন্ত রশ্মি আলোক এবং সুর একত্র মিলিত, উদীয়মান সূর্য্য হইতে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, যেন আলোকমিলিত সুর-রশ্মির বৃষ্টি হইতেছে, যাহাতে দিঙ্মণ্ডল মধুময় করিয়া দিয়াছে, আমরা তাহাতে স্নান করিয়া ধন্য হইতেছি। অসীম পবিত্রতাময় এই লোক, তাহাতে অপার্থিব আনন্দের আভাস যেন আর কিছুই নাই। স্থূল শরীর ধরিয়া যাহারা এই কঠিন ধরাপৃষ্ঠে নিজ নিজ ক্ষুদ্র অধিকার লইয়া নিজ নিজ জীবন-দ্বন্দ্বে মাতিয়া রহিয়াছে, কি করিয়া তাহাদের এই স্বর্গীয় সুর-আলোকে মিলিত আনন্দধারার কথা বুঝাইব!

একজন মানুষ যদি ঐ রাজ্যে তাহার ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত স্থূল শরীর লইয়া আসে, তাহার পক্ষে এ সকল বিচিত্র অনুভব অসম্ভব। যে রাজ্যে আসিয়া আমি এই অপূর্ব্ব নানাবর্ণের আভাময় শরীরগুলি দেখিতে পাইতেছি, স্পষ্টরূপে এই বায়ুমণ্ডলের মধ্যস্থিত সকল অনুভবগুলি গ্রহণ করিতে পারিতেছি, সে রাজ্যের শরীর স্বতন্ত্র, বৃত্তি স্বতন্ত্র, সবই স্বতন্ত্র। এখানে স্থূল শরীরে আসিলে তাহার কিছুই অনুভব করিবার সম্ভাবনা থাকিবে না, কারণ মানুষের সবটাই স্থূল—তাহার দেখা, তাহার শুনা, তাহার স্পর্শ, তাহার আঘ্রাণ, তাহার রসাস্বাদন, সবটুকুই স্থূলকে অবলম্বন করিয়া। স্থূল-জগতে যাহারা অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম অনুভূতি-

সম্পন্ন, তাঁহাদের মধ্যে কল্পনার প্রবণতা থাকায় সত্য অনুভব সকল নিস্তেজ। আশ্চর্য্য এইটুকু, এখানে সত্যের আলোকে সবটাই উদ্ভাসিত; সকল দেখা, সকল শুনা, সকল স্পর্শ, সকল আস্বাদনই সত্য, এবং সেই অনুভব জাগ্রতভাবেই সত্য, স্বপ্নময় অথবা ক্ষীণ নহে—এইটুকু বলা ছাড়া ইহা পরিষ্কার বুঝাইবার আমার আর কোনও উপায় নাই,।

আমার স্থূলশরীর পরিবর্ত্তনের কথাটি আরও আশ্চর্য্য। সেই আসনে বসিয়াই ছিলাম। এই আবহাওয়ার মধ্যে কি ভাবে যে এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনটি সাধিত হইল, তাহা আমার অজ্ঞাত। যে সময়ে আমি এখানে প্রথম শব্দ শুনিয়াছিলাম, তখন হইতে যে সময়ে আমি এই পরিবর্ত্তন অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম, সেই পর্য্যন্ত এই কালটুকুর মধ্যেই এই পরিবর্ত্তন বা আকস্মিক রূপান্তর সম্ভব হইয়াছিল, ইহা ব্যতীত আর কিছুই বোধ করিতে পারি নাই। বিস্ময়জড়িত আমার অস্তিত্ব বহুক্ষণ এই সকল আলোচনায় অভিভূত ছিল, ততক্ষণ আমি অন্য কিছুই অনুভব করিতে পারি নাই, ক্রমে এই সকল ঘনীভূত বিস্ময়ের হাওয়া কাটিয়া যাইতে লাগিল; শেষে আমার পৃথিবীর কঠিন মাটি ও জলের স্মৃতি একেবারেই যেন মুছিয়া গেল—তখন এখানকার সকল ব্যাপার যে ভাবে চৈতন্যের বিষয়ীভূত হইয়াছিল, এবার তাহাই বলিব।

আভাময় এই সকল শরীরের গতি ধীর, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন দেখিতেছি, এই ধীর ভাবের মধ্যেও বেশ স্বচ্ছন্দ গতি আছে, যাহা স্থূল জগতের তুলনায় অনুমান করা কঠিন। কারণ সেখানকার স্থূল শরীরের গতি চঞ্চল—অবশ্য শরীরের লঘুত্ব ও গুরুত্ব হিসাবেই সেটা বুঝিয়া লইতে হইবে। এখানকার শরীরের আপেক্ষিক গুরুত্ব অত্যন্ত কম হওয়ায় তাহার গতি লঘু হওয়াই স্বাভাবিক। তাহা ছাড়া স্থূল মানুষের শরীরকে গতিমান্ করিতে হইলে প্রথমে ইচ্ছা, তাহার পর শক্তি-প্রয়োগ বা আয়াস করিতে হয়; কিন্তু এ শরীরকে গতিমান্

করিতে শুধু ইচ্ছাই যথেষ্ট, তারপর কোন আয়াসের প্রয়োজনই হয় না। মানুষের শরীর যখন হাঁটে তখন দুই পা একটির পর একটি মাটিতে ধরিয়া তবে গতিমান্ হয়; এখানকার শরীরে দুইটি পা ত নাই—কাজেই ইহার গতি সরল ঋজুভাবেই ইচ্ছার সঙ্গে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়। যেমন বেশীদূর হইতে রেল-পথের দিকে চাহিলে প্রসারিত লৌহময় রেখার উপর দিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ট্রেণটি নড়িতে বা এক ধারায় এক দিকে অগ্রসর হইতে দেখা যায়, অনেকটা সেইরূপ। পার্থক্যের মধ্যে ট্রেন-শরীরটি অনেকটা লম্বা এবং কঠিন বস্তুতে নির্ম্মিত, আর এখানকার শরীর সূক্ষ্ম মনুষ্যাকৃতি, আভাময় এবং নিঃশব্দগতি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখানকার শরীরগুলি মানুষের তুলনায় খুব হালকা বা অত্যন্ত লঘু; তুলনা করিলে তাই বলিয়া আকাশ ত দূরের কথা, বায়ু অপেক্ষাও লঘু বোধ হয় না—বরং এখানকার শরীরগুলি বাতাসের তুলনায় বেশ কতকটা স্থূল সেটি বুঝিতে পারা যায়; ঐ শরীরকে কিন্তু ইচ্ছামত সূক্ষ্ম ও লঘু করা যায়, তাহা বুঝিয়াছিলাম। এখানকার অধিবাসীরা জলের উপরেই গতিবিধি করে, তবে সময়ে সময়ে—তখন জানিতাম না কি ভাবে—আধারভূত জলতলের বেশ কতকটা উপরেও যাইতে পারে; কিন্তু সেই উর্দ্ধগতির সঙ্গে শরীরটিও অদৃশ্য হইয়া যায়, শূন্যে তাহাদের শরার লক্ষ্য হয় না। তাহারা অন্তরীক্ষেও গতিমান হয়।

সাধারণত এখানকার বায়ুমণ্ডল স্থির, তরঙ্গহিল্লোল নাই, এরূপই অনুভব হয়; কিন্তু কখনও কখনও এমনও দেখা যায়, উচ্চে তরল মেঘের গতাগতি এবং বায়ুর প্রবল গতি, তাহাতে স্বাভাবিক সূর্য্যকিরণ-রশ্মি-উদ্ভাসিত সুরের রেশ কতকটা প্রতিহত হয়, কিন্তু এ রাজ্যে অধিবাসীগণের শরার গতির কোন ব্যতিক্রম হয় না। ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, যে-কোন কারণেই হোক, এ শরীরের উপর বায়ুর কোনও ক্রিয়া বা প্রভাব নাই—ঝড়ের মধ্যেও ইহা স্থির থাকে।

এখানকার প্রাণিগণের কর্ম্মের কথা বলিবার পূর্ব্বে অন্যান্য বিষয়ে আর কিছু বলিবার আছে। এখানকার বায়ুমণ্ডলে দিবাভাগে সুরধ্বনি-মিলিত আলোক-রশ্মির কথা বলিয়াছি। এখানে উহারই কেবল মাত্র শব্দ নয়, ক্রমে ক্রমে যতই এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচিত হইতেছি, ততই আরও বিচিত্র শব্দের আভাস পাইতেছি—উহা সুর নয়, শব্দ বলাই ঠিক। সে সকল শব্দ চারিদিক হইতেই আসিতেছে, আর অসংখ্য জীবপূর্ণ মানব-রাজ্য হইতেই যেন আসিতেছে, স্পষ্টতর বুঝিতে পারিতেছি। ক্রমে ক্রমে সেই সকল শব্দের অনুভব বেশ তীব্রভাবেই হইতে লাগিল! সেই সকল শব্দ অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার অধিবাসীর গতির পরিবর্ত্তনও লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। শব্দ সকল এক একটি ভাব লইয়া আসে; সেই শব্দের বিচিত্র প্রভাব এখানকার প্রাণীগণের উপর কতটা গভীর এটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। এখানকার অধিবাসীদের এখন হইতে আপ্-দেব বলিয়াই বলিব, তাহাদের অন্য কিছু বলিতে মন চায় না।

এই আপ্-দেবগণের গতিবিধি দুই, তিন, চারি, অথবা আরও অধিক সংখ্যায়—এক একটি দলে মিলিত। কোথাও একটি দেখিতেছি না। উহা নয়নের পক্ষেও বড় মনোরম। প্রত্যেকের ঘন বর্ণপ্রভায় উদ্ভাসিত শরীরের শীর্ষদেশ এবং হৃদয় এই দুই অংশ অপেক্ষাকৃত জ্যোতির্ম্ময়। কোনও একটি বিশেষভাবে ভাবিত হইলে, ঐ দুই অংশই বিচিত্র আভাময় হইয়া উঠে। সেই সকল উজ্জ্বল বর্ণাভাস তরঙ্গের মতই চঞ্চল বা ক্রিয়াশীল—যেন ঢেউ খেলিয়া গেল, এইরূপ বোধ হয়। বিশেষ একটি ভাবের অস্তিত্ব, বর্ণময় তরঙ্গাকারেই তাহার অভিব্যক্তি! আমার চৈতন্যের মধ্যে এই সকল বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রভাব, সঙ্গে সঙ্গে দিব্য শরীরের মধ্যে আনন্দ-ঘন উজ্জ্বল তরঙ্গহিল্লোলে আকুল করিয়া তুলিল। তখন এখানকার সকল ভাবের সঙ্গে পরিচয় ঘটে নাই। পরে ক্রমে ক্রমে যখন সকল ভাবের পরিচয় পাইতে

লাগিলাম, যাহা উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, ক্ষোভ, অসন্তোষ বা অপ্রিয় ভাবসমূহ নির্দ্দেশ করে। সে সকল ভাবের বর্ণাভাস উজ্জ্বল নহে বরং বিপরীত; সে বর্ণের তরঙ্গ সকল ম্লান, ধূম্রবর্ণ, গাঢ়, অস্বচ্ছ ভাবের তারতম্যানু-সারেই ঔজ্জ্বল্যহীন বা মাধুর্য্যবর্জ্জিত।

এখানকার কর্ম্মজীবন অপূর্ব্ব, অসাধারণ এবং বিস্ময়কর। এ এ রাজ্যের কর্ম্মরীতি বুঝিতে গেলে প্রথমে স্থূল-জগতের কর্ম্মধারার সঙ্গে আকাশ-তরঙ্গের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা জানিতে হয়। তার আসল ব্যাপার এই যা-কিছু কার্য্য ধরাতলের নানাস্থানে, জীবরাজ্যের মধ্যে ঘটিতেছে, নানা অবস্থার মধ্যে নানা লোক-সমাজের মধ্যে অবিরাম অনুষ্ঠিত হইতেছে, উহার সকল অংশই বায়ুমণ্ডলের মধ্যে অর্থাৎ আকাশে তরঙ্গ তুলিতেছে, কিছুই বাদ যাইতেছে না। শুধু শব্দ নয়, প্রত্যেক চিন্তার সঙ্গে যে তরঙ্গ উঠিতেছে, সেই তরঙ্গের প্রভাব সূক্ষ্মরাজ্যে এখানকার অন্তরীক্ষে খুব বেশী। সাধারণভাবে স্থূল বুদ্ধিতে ধরিবার জো নাই—এ সকল কি ভাবে সম্ভব হইতেছে! আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে যদি আকাশ-তরঙ্গের রূপ দেখা যাইত, তাহা হইলে যে অদ্ভুত ছবি নয়নগোচর হইত, তাহা দেখিয়া মানুষের জ্ঞান, বিদ্যা ও বুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়া যাইত। সজীব তরঙ্গের রেখায় রেখায় আকাশের সর্ব্বস্থান পরিপূর্ণ। এই বিশাল আকাশ-মহাসমুদ্রে যেন তিলমাত্র স্থান বাদ নাই ; অথচ প্রত্যেকটি পৃথক্, কোনটির সঙ্গে কোনটি মিশিয়া যাইতেছে না, অবিরাম এই তরঙ্গেই খেলা চলিতেছে।

শব্দটা স্থূল, তাহার তরঙ্গও অপেক্ষাকৃত স্থূল, এখনকার দিনে যন্ত্রের সাহায্যে ধরা যায় ; কিন্তু চিন্তা অথবা ভাব-বস্তু সূক্ষ্ম, উহা যন্ত্রের মধ্য দিয়া ধরিবার শক্তি চিরদিনই অভাব থাকিবে। কারণ ভাব বা চিন্তাপ্রবাহ জড়ধর্ম্মী নয় ; তাহাকে ধরিতে চিৎসত্তা ব্যতীত অপর কাহারও সাধ্য নাই, সম্ভাবনা নাই। জীবরাজ্যে এই যে অনুসন্ধিৎসা, যাহাকে আমরা চিন্তা নামে অভিহিত করি, সেই চিন্তাধারার মধ্যেও বিশেষ তারতম্য আছে। বিক্ষিপ্ত এবং ক্ষীণ চিন্তাপ্রসূত তরঙ্গ বা

স্পন্দন ক্ষীণ হইয়া থাকে, উহা বহু দূর প্রবলভাবে প্রসারিত হইতে পায় না। আবার তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন প্রবল চিন্তাধারা প্রবল তরঙ্গ উৎপন্ন করে এবং বহুদূর প্রসারিত হইয়া পড়ে। চিন্তা ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত দুই ভাবেই চলে; এখন ব্যক্তিগত চিন্তা বা ভাবধারার কথাই আমাদের আলোচ্য। তারপর সমষ্টির কথা।

মানুষের জাগ্রত অবস্থায় দুইটি কাজ আছে,—শরীর হাত-পা প্রভৃতি কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় লইয়া কাজ, আর চিন্তা। আবার চিন্তা করিতে করিতেও কর্ম্ম চলে। আসলে মানুষের চিন্তা ও কর্ম্ম, এই দুইটির সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। কর্ম্মের পূর্ব্বে চিন্তা আছে; কাজেই প্রত্যেক কর্ম্মেই আকাশে স্পষ্ট হিল্লোল তুলিয়া বায়ুমণ্ডল আলোড়িত করিতেছে। বিক্ষিপ্ত না হইলে তরঙ্গের প্রবাহ স্পষ্ট হয়। একটি ভাব বা চিন্তার ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে চিত্তক্ষেত্রে তরঙ্গ তুলিতে না তুলিতেই আর একটি চিন্তার সূত্র আসিয়া আকাশে অসম্পূর্ণ এক প্রবাহ সৃষ্টি করিল। ইহাই হইল বিক্ষেপ। শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন, সুস্থ যে চিত্ত, তাহাই সম্পূর্ণ ধারায় প্রবাহ সৃষ্টি করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র; কিন্তু মানুষের বিপদ্ এবং প্রাণ-ভয় সর্ব্বাপেক্ষা গভীর এবং ঘন তরঙ্গ তুলিয়া আকাশমণ্ডল আলোড়িত করিতে পারে। বিপদ্ এবং ভয়ের তুল্য এমন শক্তিশালী তরঙ্গ তুলিতে ব্যবহারিক জগতে আর কিছু দেখা যায় না।

তারপর দ্বিতীয় কথা এই যে, এখানকার শরীর এমন সূক্ষ্ম, এমন অপূর্ব্ব উপাদানে, আশ্চর্য্য কৌশলে নির্ম্মিত, যে, জীবজগতের প্রত্যেক স্পন্দনের তরঙ্গে সাড়া দেয়। যত কিছু ঘটনা, যত কিছু চিন্তা এবং কর্ম্মব্যাপার, ভিতরেই হোক বা বাহিরেই হোক, এ রাজ্যের কিছুই অগোচর থাকে না। ধরাতলবাসী মানব-মনের অন্তরতম প্রদেশ হইতে সূক্ষ্মভাবে কোনও চিন্তার স্পষ্ট অভিব্যক্তি মাত্রেই এখানে তাহার সাড়া পৌঁছায়। এখানকার সকলেই অন্তর্য্যামী, তাহা হইতেই

এখানকার কর্ম্মপ্রেরণা আসে. এবং কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে সহায়তা করে। সংক্ষেপে এটুকু জানিয়া রাখা ভাল, যে এই সকল অব্যক্ত ক্রিয়াশক্তির মূল হইল আদিত্য। এই সৌর-দেবতার কিরণরশ্মি ধরিয়াই এখানকার জীব-কোটী, শুধু এখানকার কেন, সমগ্র সৌরজগতের অধিবাসী জীবসমষ্টির প্রাণশক্তি, চিন্তা, কর্ম্ম, জ্ঞান, সিদ্ধান্ত, স্থূল সূক্ষ্ম কারণ নির্বিবশেষে যাহা কিছু হইতে পারে, তাহা এই আকাশ-তরঙ্গ অবলম্বন করিয়াই অবিরাম প্রেরণা দিতেছে, কখনও ক্ষণেকের জন্যও তাহার বিরাম নাই, ব্যতিক্রম ঘটে না।

ইহার পর প্রকৃতির সহজ নিয়মের বিষয় আর একটু জানিবার কথা আছে। আমাদের এই জীব-জগতে দুইটি শক্তির ক্রিয়া অবিরাম চলিতেছে দেখা যায়; তাহা প্রত্যক্ষের মতই স্পষ্ট—আকুঞ্চন ও প্রসারণ নামেই তাহাদের অনুভূতি ও অভিব্যক্তি। এই দুইটি শক্তিকে অবলম্বন করিয়াই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কাণ্ড অবিরাম চলিতেছে। ব্যষ্টিগত জীবপ্রকৃতি ও সমষ্টিগত জীব-প্রকৃতি এই দুইটি ক্রিয়াশক্তির প্রত্যক্ষ ফল। আকুঞ্চনে জীব কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়; কেন্দ্র হইল চৈতন্য বা আত্মা, আর প্রসারণে কেন্দ্র হইতে দূরে প্রসারিত হয়। ইহার প্রত্যক্ষ ক্রিয়াফল যাহা আমরা সহজ বুদ্ধির সাহায্যে ধরিতে পারি তাহারই আকুঞ্চনে অর্থাৎ কেন্দ্রাভিমুখী গতির ফলে তত্ত্বজ্ঞানের অনুভূতি, নিষ্ঠা, যোগ, গভীর তন্ময়তা এবং মৃত্যু; আর প্রসারণের ফলে অর্থাৎ কেন্দ্র হইতে বহির্গতির ফলে কর্ম্মপ্রবৃত্তি, ভোগবিলাস, আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষা, ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ অধিকার এবং জীবন।

এখন ইহার মধ্যে এইটুকু বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করিবার আছে যে, যখনই জীবের চৈতন্যশক্তি কেন্দ্র হইতে প্রসারিত হইতেছে তখন কেন্দ্র হইতে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে না, কেন্দ্রের সঙ্গে তাহার সূক্ষ্ম যোগ থাকিয়া অবিচ্ছিন্ন ভাবেই প্রসারিত হইতেছে;—আবার যখন আকুঞ্চিত হইতেছে তখন তাহার প্রসারের সীমা হইতে

বিস্তৃতির অনুভব অচ্ছেদ্যরূপে লইয়াই ফিরিতেছে তাহাই আমাদের জীবন।

এই শক্তির ক্রিয়া অবিরাম জগৎ জুড়িয়া অবাধ চলিতেছে, কোথাও ইহার অভাব নাই; কাজেই সৃষ্টির অদ্ভুত কৌশলেই সৃষ্টিকে বাঁচাইবার উপায় ইহার মধ্যেই অন্তর্নিহিত আছে, যাহা বাহিরে কোনও সাহায্যের অপেক্ষা রাখিতেছে না।

এই অপূর্ব্ব লোকের অধিবাসী—দিব্যদেহধারিগণের এসকল অনুভব আমাদের পৃথিবীর জীবগণের শ্বাস-প্রশ্বাসের মতই সহজ এবং স্বভাবগত। সেই কারণে তাঁহাদের কর্ম্ম, সর্ব্বক্ষেত্রেই কল্যাণকর, শুভপরিণামশীল এবং অশেষ আনন্দ উদ্দীপক। তাঁহাদের উদ্দিষ্ট সেই কল্যাণ জগতের চক্ষে বিরুদ্ধভাবের কিম্বা আরও কত কিছুই মনে হইতে পারে। এই দ্বন্দ্বময়জীবন মনুষ্যসমাজের বিচারের কথায় আর নাই, এইটুকু কেবল পুনরুক্তি করিয়া পাঠকের স্মরণে রাখিবার সাহায্য করিতেছি যে, এ লোকের, এই আনন্দময় কর্ম্মরাজ্যের কেন্দ্রস্থ দেবতা, যাঁহার প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশই এখানকার প্রেরণা, তিনি হইলেন আদিত্য;—যাঁহার অধিকারে কোনও দিক্ দিয়াই অমঙ্গল বলিয়া কিছু কল্পনার কল্পনাও এখানে অসম্ভব।

অবশ্য এই সৌরজগতের সকল গ্রহনক্ষত্রের কেন্দ্র হইল আদিত্য; সকল লোকেরই কর্ম্মশক্তি এই আদিত্যকেন্দ্র হইতেই নিরন্তর সঞ্চারিত হইতেছে—তবে এ লোকের কথা এত বিশেষ করিয়া বলিবার তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য আছে, তাহা বলিতেছি। এই পৃথিবীর কথাই ধরা যাক, যেহেতু আমাদের অন্যে অধিকার নাই। এই ধরণীর মানুষসমাজই প্রাণীজগতে শ্রেষ্ঠ। এই মানুষসমাজের মধ্যে নানা স্তরের মানুষ ত আছে, তাহার মধ্যে কত অল্পসংখ্যক মানুষ সূর্য্য হইতে স্থূলভাবে যেটুকু উপকার সাধারণে পায়, তাহার অতিরিক্ত কিছু ভাবিতে পারে—বোধ হয় সংখ্যার হিসাব করিলে মনটি আমাদের ছোট হইয়া যাইতে বাধ্য।

এখানকার লোকে, দিব্যদেহধারিগণের সূর্য্যের সঙ্গে সম্বন্ধ এতটা প্রত্যক্ষ এবং সহজ অনুভূতির বিষয় যে, পৃথিবীর অন্যান্য মানুষরাজ্যের সঙ্গে তার তুলনাই হইতে পারে না—পূর্ব্বেই ইহা আভাসে কিছু বলিয়াছি। ভূমণ্ডলের মানুষসমাজের যত কিছু উন্নতি হউক না কেন, বিশ্বশক্তির কেন্দ্র বলিয়া আদিত্যের কোন অনুভূতি সে মানুষসমাজের নাই, তাহা আমরা সহজ-বুদ্ধিতেই বুঝিতে পারি; অথচ যত কিছু সুখ সুবিধা সূর্য্য হইতে পাওয়া যায় তাহা জগদ্বাসী স্বভাবগত আত্মীয় সম্পর্কে এবং অনায়াস-ক্রমেই পাইয়া থাকে এবং তাহাতে নিজ নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিতেছে। তবে অতীব অল্পসংখ্যক এক শ্রেণীর মানুষ আছেন, ভারতীয় মতে যাঁহারা জড়বিজ্ঞানবিদ্, পাশ্চাত্যভাষায় সায়ান্টিস্ট, বঙ্গানুবাদে বৈজ্ঞানিক নামে প্রচলিত, সেই ক্ষুদ্রতম অনুসন্ধিৎসু অধ্যবসায়শীল সমাজ আদিত্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া থাকেন, ইহা সত্য। কিন্তু এই পাশ্চাত্যজাতীয় মানুষে এখনকার জগতে শ্রেষ্ঠ এবং ভারতের আদর্শ হইলেও জড়ব্যবসায়ী অর্থাৎ বিরাট প্রকৃতির অধিকার মাত্র জড়রাজ্যের একান্ত অনুরক্ত এবং তাহার উপাসনায়ই নিমজ্জমান বলিয়া স্বভাবতই স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন। সেই কারণেই দূরবীক্ষণের সাহায্যে আদিত্যের স্থূল প্রকাশ লইয়াই ব্যস্ত। অন্য সময় সূর্য্যের দিকে টেলিস্কোপ ফিরানো একেবারেই অসম্ভব, কাজেই গ্রহণকালীন কেন্দ্রস্থ নিস্তেজ ছায়ায় সূর্য্যের মণ্ডলপ্রান্তে জ্যোতির মধ্যে বিশেষভাবে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আবিষ্কারেই তাঁহাদের সূর্য্যতত্ত্ব-সংগ্রহের চেষ্টা—যেহেতু অন্য উপায় সে রাজ্যে অনাবিষ্কৃত। তবে অধুনা সূর্য্যের রোগ আরোগ্যকারী শক্তির সহিত পরিচিত এমন কেহ কেহ আছেন দেখা যায়। সভ্য সমাজের অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিরই এ তত্ত্ব বিদিত।

তারপর এদিকে ভারতবাসী-সাধারণের কথা! এখনকার দিনে পাশ্চাত্যের একান্ত অনুকরণে সঞ্জীবিত হইলেও তাহাদের মধ্যে হিন্দু

সনাতনপন্থী কেহ কেহ সূর্য্যোপাসনা করেন। আদিত্য উপাসনায় মন্ত্রজপ, স্তোত্রপাঠাদি নিয়ম তাঁদের মধ্যে বলবৎ থাকিলেও, আসলে সূর্য্যসম্বন্ধে স্বার্থপ্রাণোদিত অজ্ঞানমূলক একটি ভাব ব্যতীত মহান্ সত্যের প্রতি লক্ষ্য এতই বিক্ষিপ্ত যে, তাহার প্রভাব নিকটস্থ কাহারও হৃদয়ে মনে লাগে না, তাহা এতটা প্রাণহীন। সুতরাং নবীন সভ্যতাগর্ব্বিত পাশ্চাত্যই হোক, এবং প্রাচীন সভ্যতাবর্জ্জিত সনাতন ভারতবাসীই হোক, আদিত্য সম্বন্ধে উভয়েই সমান-ফলভাগী। কারণ উভয়পক্ষেই যথার্থমার্গে তত্ত্বানুসন্ধানে ঐকান্তিকতার অভাব সুস্পষ্ট। বিরাট জনসমষ্টির কথায় কাজ নাই। এখানকার এই দিব্যরাজ্যে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে, প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে আদিত্য-শক্তি প্রাণে প্রাণে ওতপ্রোত বর্ত্তমান থাকে, যাহার কখনও অন্যথা হয় না এবং হইবার নয়। ইহাতেই তাঁহারা মহাশক্তিমান্। আসলে এখানকার সকলেই যথার্থ আদিত্য-তত্ত্বে সঞ্জীবিত এবং তাহাতেই সর্ব্বক্ষণ অনুপ্রাণিত। একথা বলিলে কিছুমাত্র ভুল হয় না, যে পৃথিবীর মানুষ সূর্য্য সম্বন্ধে কতকাংশ কল্যাণভোগী হইলেও, অজ্ঞান এবং শক্তির অপব্যবহার হেতু নিয়ত দ্বন্দ্বময়, দুর্ব্বল আনন্দ ও শান্তিবিমুখ, আর এখানকার দিব্যদেহধারিগণ সূর্য্য বা আদিত্য-তত্ত্বে সমাহিত বলিয়া মহাশক্তিমান, নিরন্তর আনন্দ ও শান্তিময়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখানে সূর্য্যরশ্মির মধ্য দিয়া যে দিব্য সুরের রেশ আমরা পাইয়া থাকি, সেই রশ্মির মধ্য দিয়া সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বহুবিধ শব্দতত্ত্ব এবং এক অপূর্ব্ব স্পর্শের পুলকও অনুভূত হয়। সেই পুলকপ্রবাহ এই দীপ্তিমান্ শরীরে মহানন্দের সঙ্গে সঙ্গে মহাশক্তির অনুভূতি আনিয়া দেয়, তাহাতেই এখানকার কর্ম্মপ্রবাহ চলিতেছে।

উপরে ঘন মেঘ বায়ুমণ্ডলে ব্যাপ্ত থাকিলে রশ্মি ক্ষীণ থাকে। তাহাতে অনুভূতির উপর আবরণ পড়ে, কিন্তু কর্ম্মে লিপ্ত থাকিলে

যুক্তাবস্থায় তাহাতে নিরানন্দ বোধ হয় না; কিন্তু এখানকার ভোগই হইল ঐ সূর্য্যরশ্মিমিলিত দিব্যতত্ত্বসকলের অনুভব। কর্ম্মশূন্য অবস্থায় সূর্য্যের আনন্দময়-রশ্মির অপ্রকাশ, কোন প্রকার আবরণ এখনে দিব্য-অধিবাসীগণের সহ্য হয় না। তখন স্থানান্তরে, অবশ্য এই অন্তরীক্ষেই ভূবর্লোকে উর্দ্ধে অথবা অপর অংশে, যেখানে আদিত্যের পূর্ণ প্রকাশ সেইখানেই যাইতে হয়। এই দিব্যপ্রাণিগণের অন্তরীক্ষে অবাধ গতি। ঋতুপরিবর্ত্তনের ব্যাপার বড়ই চমৎকার এবং আনন্দময়, তাহা পরে যথাসময়ে বলিব। এখন কর্ম্মের কথা।

এখানকার দেবদূতগণের কর্ম্ম-ক্রম আমার মধ্যে ধীরে ধীরে বিকশিত হইতে লাগিল। যে ভাবে বিকশিত হইয়াছিল, আমি ঠিক সেই ভাবেই বলিব, যদিও আমার আকস্মিক অনুভূতির সকল কথা বলা সম্ভব হইবে না। আমার রূপান্তরের পর, বিস্ময়ের প্রবল বেগ প্রশমিত হইল, প্রথমে এক অপূর্ব্ব অনুভূতি আমার হৃদয়দেশে ধীরে ধীরে আসিতে লাগিল। কোনও একদিকে যেন বিশেষ অশান্তি অথবা সঙ্কটভীতির বার্ত্তা;—বিপদ-কাতর হইয়া যেন কাহারা গভীর দুঃখ পাইতেছে, বড় কাতর আহ্বান। এইটি যেন সংবাদের কাজ করিল। তখনই সেই স্থানে গিয়া তাহাদের অবস্থা লক্ষ্য করিতে প্রবৃত্তি হইল। হৃদয়ে সহানুভূতি প্রবলভাবেই জাগিয়া উঠিল এবং একটি অপূর্ব্ব আকর্ষণ অনুভূত হইল। অবশ্য এই আর্ত্তি সেইস্থানের সর্ব্বত্রই প্রসারিত হইয়া পড়িল, তাহাতে সেখানকার অন্তরীক্ষবাসীদের গণের কাহারও জানিতে বাকী রহিল না। কিন্তু দেখিলাম—ইঁহাদের মধ্যে নির্ম্মল-ক্ষীণ-লোহিতাভ শরীর দুই জন ক্রমে উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন। আমার অন্তঃকরণ প্রবল সহানুভূতিতে পূর্ণ ছিল, আমিও উঠিলাম এবং তাঁহাদের সঙ্গে মিশিলাম। উর্দ্ধে উঠিয়া অদৃশ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিমেষ মধ্যেই আমরা যথাস্থানে উপনীত হইলাম।

সিংহলের দক্ষিণে সমুদ্রতীর হইতে কিছু দূরে দুইখানি নৌকা,

একখানি হইতেই এই বিপদের বার্ত্তা। এক বণিক মহাজনের নৌকায় দস্যু পড়িয়াছে। মহাজনের সেই নৌকায় অতীব সুন্দরী দুইটি যুবতী নারী, তিন-চার জন দস্যু মিলিয়া তাহাদের বলপূর্ব্বক অপর নৌকায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। কাতর আর্ত্তনাদ তাহাদেরই, যাহাতে আমাদের বিচলিত করিয়াছিল এবং তাঁহাদেরই ব্যাকুলতায় আমাদের এখানে আনিয়াছে। দস্যুগণ সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। কয়েকজন লোককে বাঁধিয়াছে, তাহারা ভীত এবং মুহ্যমান্। ধনরত্ন লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি লইয়া অপর কয়েকজন ব্যস্ত। অধিকারী একজন যুবক, বদ্ধাবস্থায় পড়িয়া আছে, তাঁহার অবস্থাও ভয়ে মুহ্যমান।

আমাদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই দুর্বৃত্তগণের মধ্যে একটা আকস্মিক ভয় এবং আর্ত্তগণের মধ্যে একটা সাহস সঞ্চারিত হইল। দেবদূতগণের আবির্ভাবের ইহাই প্রথম পরিচয়। আমরা কিন্তু অন্তরীক্ষেই রহিলাম, সেইখানেই সকল ব্যাপারই দেখিলাম। কর্ত্তব্য আমাদের স্থূলভাবে কিছুই নাই, যেহেতু আমাদের স্থূল-শরীর নয়। প্রবলভাবে অভয় ইচ্ছাশক্তি আর্ত্তগণের প্রতি প্রয়োগ এবং দস্যুগণের অপকর্ম্মের প্রতিবাদে তাহাদের পাতকের অশুভ ফলাফলের বিষয়, দুষ্ট প্রবৃত্তির নিশ্চিত অমঙ্গল তাহাদের অন্তঃকরণে প্রবলভাবে আমাদের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা জাগ্রত করাই হইল আমাদের প্রথমত প্রধান কর্ম্ম। পশু-শক্তির প্রাবল্যে ভয়ানক উত্তেজনাবশে এবং লোভের প্রভাবে তাহাদের মধ্যে আমাদের এই সকল চেষ্টা প্রথমে প্রতিহত হইলেও, সত্যের প্রভাবে তাহাদের মধ্যে অনিবার্য্য দুর্ব্বলতা আসিতে লাগিল।

আর্ত্তগণের হৃদয়ে বল সঞ্চারিত হইলে তাহার ফল এই হইল,—যাহাদের সুযোগ ছিল তাহারা সাহস করিয়া পুনঃ পুনঃ দস্যুগণকে আক্রমণ করিতে এবং তাহাদের সঙ্গীগণের বন্ধনমোচনে সচেষ্ট হইল। আমাদের মধ্যে দুই জনের লক্ষ্য নারীদ্বয়ের প্রতি বিশেষ ক্রিয়া করিতেছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের আবির্ভাবের সঙ্গেই

তাহাদের হৃদয়ের মধ্যে সাহস এবং বিপদুদ্ধারের আশা যুগপৎ ক্রিয়া করিল। তাহারা এমন অপূর্ব্ব কৌশলে, বলপূর্ব্বক যাহারা তাহাদের ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল তাহাদের প্রতিবাদে এমন প্রবলভাবে আত্মরক্ষার জন্য বাহুদ্বয় চালনা করিল যে, তাহাতে একজন নৌকার কিনারায়, অপর জন সমুদ্রের জলে পড়িয়া গেল। ক্রমে মহাজনের দলের মধ্যে মুহ্যমান্ অবস্থাটি কাটিয়া গেল এবং প্রাণপণ শক্তির প্রয়োগে তাহারা নিজ নিজ আপদুদ্ধারের চেষ্টায় প্রবৃত্ত দেখা গেল। তারপর যাহা হইল তাহার মধ্যে বিশেষত্ব এইটুকু যে, নারীদ্বয়ের বিপদুদ্ধারের জন্য অস্ত্র গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা এবং দস্যুদল নিজেদের শক্তিহীন বিবেচনা করিয়া আপনাদের নৌকায় আশ্রয় লইয়া দ্রুতগতি পলায়নের চেষ্টা। একজন দস্যু অত্যন্ত আঘাত পাইয়া মুমূর্ষু হইয়াছিল, আরও চার জন আহত হইয়াছিল; দলের লোকেরা তাহার শুশ্রূষায় সচেষ্ট হইল। এই আহবে নারীগণের যে অসীম সাহস ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া গেল, তাহার প্রধান কারণই আমাদের সঙ্গী দুইজন দেবদূতের বিশেষ শক্তিপ্রয়োগ। তিনটি বিষয় এক্ষেত্রে, আমার এই নবজীবনের কর্ম্মারম্ভে লক্ষ্যের বিষয় হইল।

প্রথম—দেবদূতগণের শক্তি মানুষের বুদ্ধির উপর প্রযুক্ত হয়, ভীত মুহ্যমান্ অবস্থায় তাঁহাদের শক্তির ক্রিয়া বিশেষভাবেই অনুভূত হয়। তাঁহারা অভয়দাতা। দ্বিতীয়—দুষ্ট অভিপ্রায় যাহাদের, তাহাদের পশুবলের উত্তেজনায় প্রাবল্য হেতু প্রথমে তাহারা শক্তিমান্ বোধ করিলেও, পরে তাহারা দেবদূতগণের শক্তিপ্রভাবে দুর্ব্বল হইতে বাধ্য। তৃতীয়—দেবদূতগণের শক্তির ক্রিয়া বিপদগ্রস্ত আর্ত্তের ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়াই প্রকাশিত হয়; কোনও ক্রমে পৃথক্‌ভাবে অনুভূত হইবার নয়। এই ভাবে যাঁহারা এই দেবদূতগণের কৃপায়, অভয়শক্তি-প্রয়োগের ফলে বিপন্মুক্ত হন, তাঁহারা সাধারণত নিজ শক্তিতে উদ্ধার পাইলেন, এই মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন—অহঙ্কার তাঁহাদের প্রবল

থাকে, তাহাতে সুপ্তশক্তি জাগ্রত হইবার পক্ষে সহায়তা করে। এই সকল বুঝিতে পারিলে সহজেই ধারণা হইতে বাধা থাকে না যে, অন্তরীক্ষবাসী দেবদূতগণের কর্ম্ম এই জগতের মানুষের পক্ষে সকল দিকেই মঙ্গলময়, তাঁহাদের সংস্পর্শে অমঙ্গলের নামটি নাই। যাঁহারা সাত্ত্বিকভাবাপন্ন, তাঁহারা এইভাবের বিপদুদ্ধারের পর সংস্কারবশে ভগবানের কৃপায় বিপন্মুক্ত হইলেন মনে করিয়া অজ্ঞাত কোন এক মহান্ অস্তিত্বের কল্পনায় নিজ বুদ্ধিকে পরিচালিত করেন। তাহাতেও কল্যাণ অবশ্যই আছে।

কোন কঠিন বিপদ, যাহাকে দৈব বিপদ বলে, যাহাতে মানুষের হাত নাই, সাধারণ মানুষ সেই সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাইলে বলে যে, ভগবান রক্ষা করিলেন। মুখে বলা শুধু নয়, যেন নিশ্চিতরূপে ভাবিয়াও থাকে। কিন্তু যথার্থ ব্যাপার যাহা ঘটে তাহা যদি জানিবার সুযোগ হয় তাহা হইলে আর কেহ ভগবান বলিয়া কাহাকেও ডাকিবে না। বাস্তবিক সে সকল আপদ উদ্ধারের ব্যাপার এ সকল আপদেবগণেরই কার্য্য। দেবদূত কথাটা মানুষের কানে বড়ই মিষ্ট শুনায়, তাই তাহাদের দেবদূতই বলিলেও দোষ হয় না—তাহাতে বোধ করি অর্থ বিপর্য্যয়ও ঘটিবে না।

বলিতেছিলাম, যখনই অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিপাকে পড়িয়া মানুষ কাতর প্রাণে বিপদের গুরুত্ব হৃদয়ে অনুভব করে তখনই স্বভাবের নিয়মে আপদ উদ্ধারের আশায় সে একটি বিরাট শক্তির সহায়তা চায় যিনি তাহাকে বিপদমুক্ত করিতে পারিবেন, আর তাঁহাকেই সে ভগবান বলিয়া জানে। তখনই মানুষ নিজ শক্তিকে ক্ষুদ্র ও অক্ষম নিশ্চিতরূপেই ধারণা করিতে পারে। কিন্তু এ স্থষ্টির এমনই নিয়ম, ভগবান কি বস্তু, কোথায় তাঁর অধিষ্ঠান, তাঁর স্বভাবই বা কিরূপ, মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধই বা কি, এ সকল বিষয়ে কোন স্পষ্ট জ্ঞান না থাকিলেও তাহার অন্তরের ঐকান্তিক ব্যাকুল আর্ত্তিভাব-তরঙ্গে প্রবাহরূপে সঙ্গে সঙ্গে ঠিক জায়গায় পৌঁছায় ;—আর প্রতিকারও, তাহার অন্তরে বিপদ অনুভূতির গভীরতা বা পরিমাণ অনুসারে, শীঘ্র বা বিলম্বে আসিয়া থাকে। বিপদ অনুভব এবং বিপদ উদ্ধার ইহার মধ্যে যত কিছু বেদনা, আতঙ্ক, অবর্ণনীয় নৈরাশ্য জনিত উদ্বেগ, আবার সময়ে সময়ে সেই প্রচণ্ড উদ্বেগের তাড়নায় স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও শারীর-যন্ত্রের বিকৃতি, হয়ত এ সকলও তাহাকে

সহ্য করিতে হয়। তাহার কর্ম্ম-সংস্কারগত ভোগশরীর ও মনের দুর্ব্বল গঠনের ফলে এই সকল দুঃখ আসিয়া থাকে তাহাও হয়ত সে জানে না,—কিন্তু যখন সেই বিপদ কাটিয়া যায় প্রতিক্রিয়ার ফলে সে সেই পরিমাণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, আরাম পায়, আনন্দ ভোগ করে, তাহার দুঃখ, বেদনার কাহিনী প্রিয়জনের কাছে দশ মুখে প্রকাশ করিতে চায়,—জানে কি, কোথা হইতে পরিত্রাণ আসিল? ভগবান রক্ষা করিলেন একথা সে বলিলেও, অন্তরে তাহার এ ব্যাপার রহস্যময় থাকিয়াই যায়, কারণ ভগবান বলিয়া এই যে একটি ভাব তাহাও ত মানুষের কাছে অসীম রহস্যে আবৃত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পৃথিবীর জীব-সমাজের মধ্যে যত কিছু চিন্তা এবং কর্ম্ম চলিতেছে, প্রত্যেকটি চিন্তা এবং কর্ম্ম হইতে কোন না কোন ভাবের তরঙ্গ সৃষ্টি করিতেছে আর সেই তরঙ্গে অন্তরীক্ষ মহাসমুদ্র অবিরাম আলোড়িত হইতেছে, যাহা হইতে এই আপদেবগণ নিজ নিজ কর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিতেছেন। এ কর্ম্মের ইতি দেখিতে পাই নাই। এখন আমার কোন সঙ্কোচ বা কর্ম্ম নির্দ্ধারণে বুদ্ধির অভাব নাই। তাহা অবশ্য প্রথমেও ছিল না, তবে পূর্ব্বে কোন আহ্বান আসিলে আমি দেখিতাম প্রথমে কে বা কাহারা উঠিলেন, তাহা দেখিয়া আমি তাঁদের সঙ্গে মিলিতাম। তারপর ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কি ভাবে তাঁহারা কর্ম্ম করেন, শক্তি প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য এ সকল লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতাম, তারপর আমার গতি অন্তরীক্ষের মধ্যেও একটি সীমার মধ্যে ছিল, তাহার অধিক গতি ছিল না,—এখন আর সে সকল লক্ষ্য করিয়া অনুসরণ করিতে হয় না,—এখন তরঙ্গ লক্ষ্য করিয়া স্বতই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই,—কেমন ভাবে শক্তি প্রয়োগ করিতে হয় সে বিষয়ে আর সহায়তা বা আদর্শের প্রয়োজন হয় না, আমার গতিও প্রসারিত হইয়াছে;—তবে কর্ম্ম সম্বন্ধে একটি বিশিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যেই রহিয়াছি; অন্যান্য বিশাল দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্ম সকল যাহা উচ্চ স্তরের দেবদূতগণের

অধিকারে তাহার মধ্যে আমার গতি হয় নাই। তবে বুঝিয়াছি, এখানেও কর্ম্মের ক্রমপ্রকরণ আছে, অধিকার আছে, দায়িত্ব আছে, প্রসাদ আছে, মহিমা আছে, সে সকল উচ্চ অবস্থা কর্ম্মোৎকর্ষের ফলে প্রাকৃতিক নিয়মে আপনাআপনিই হইয়া যায়। কেহ গুরু নাই, উপদেষ্টা নাই, বাকবিতণ্ডা নাই, নিস্তব্ধ একটি বিরাট প্রেমের রাজ্য, অনির্ব্বচনীয় মহিমায় এই ধরাতলের সুখ ও কল্যাণের নিয়ন্তারূপে সর্ব্বকাল ব্যাপ্ত হইয়া আছে।

এখন এখানে আমার কর্ম্ম-সম্পর্কে আর একটি ঘটনার কথা বলি তখন আমরা প্রশান্ত মহাসাগরের একটি দ্বীপের নিকটে ;—আদিত্য-রশ্মির সুধাময় কিরণে,—সুরলোকের অবিশ্রান্ত বিকীরণের মধ্যে নৃত্যে মগ্ন ছিলাম। এটুকু এখানে জানা প্রয়োজন যে, স্থূল প্রাণীজগতে নিদ্রা বা সুষুপ্তি যেমন জীবনের পক্ষে অচ্ছেদ্য নিয়ম, পরিমিত নিদ্রার অভাবে জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠে কারণ শরীর এবং প্রাণের অপচয় এই আনন্দময় সুষুপ্তিতেই পূর্ণ হয়, দৈনিক কর্ম্মজীবন আনন্দময় হয় ;—সেইরূপ অন্তরীক্ষের এই আপদেবগণের সূর্য্য-কিরণ-রশ্মি-বিকীরিত অমৃতময় সুরধারায় স্পন্দনের মধ্যে নিমজ্জিত অবস্থাই হইল নিদ্রা বা সুষুপ্তি। আদিত্য কিরণ মিলিত সুরধারার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে স্নান যে কি আনন্দময় তাহা কি করিয়া বুঝাইব ? উহা প্রকাশের শব্দ ত নাই-ই, পরন্তু প্রবৃত্তিও হয় না।

এখন যাহা বলিতেছিলাম,—আমরা প্রশান্ত মহাসমুদ্রের উপর মহানন্দময় সুষুপ্তিতে বিভোর ছিলাম,—একটি অতি কাতর, মহাভয়ের ভাবতরঙ্গ আসিয়া অন্তরীক্ষে লাগিল। শান্তিময় অবস্থা হইতে জাগ্রত হইলাম, তরঙ্গের কেন্দ্রস্থল লক্ষ্য করিলাম। ভারতের দিকটা মেঘাচ্ছন্ন, ঝড় ও মেঘের খেলা চলিতেছে। সমস্ত পশ্চিমদিগন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত জলদের মেলা, বহু ঊর্দ্ধ বেড়িয়া প্রবলভাবে আলোড়িত হইতেছে।

তরঙ্গ লক্ষ্য করিয়া মুহূর্ত্তে গিয়া পৌঁছিলাম এক গ্রামের মধ্যে, এক

সম্পন্ন গৃহস্থের আশ্রমে একটি পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় যুবা মৃত্যুশয্যায়। জীবিত পিতা, মাতা, স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনে পরিবৃত সকলের মুখে শোকের পূর্ব্বাভাস। যুবা তখন বাহ্যত অচৈতন্য, অন্তরে তাহার প্রবল দ্বন্দ্ব চলিতেছে। শ্বাসও উঠিতেছে। বুঝিলাম আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে যুবা ক্ষীণ এবং অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িতেছে।

যুবা কল্পনা করিতেছে শূন্য, নিঃসঙ্গ অবস্থা, সে যেন সঙ্গ ও সংসার হইতে নিস্তব্ধ শূন্য এক অনন্ত অন্ধকারময় লোকে যাইতেছে, তাহা বড়ই ভয়ঙ্কর। ঐ সকল তাহার জীবিত কর্ম্মাবস্থার অনেকানেক শ্রবণ মননের ফল,—আসলে সবটাই তার কল্পনা। কল্পনায় তাহার ভয় ক্রমাগতই বাড়িতেছে, সঙ্গে সঙ্গে হৃদপিণ্ডের গতিও বিষম দ্রুত হইতেছে।

এখন একথা যেন কেহ মনে না করেন যে, আমার পর্য্যায়ে এই আপদেবগণের কাজই হইল প্রাণ ভয়ে ভীত সকলকেই প্রাণে বাঁচাইয়া দেওয়া। আর সকল সময় প্রাণে বাঁচানোটাই যথার্থ কল্যাণের কাজও হয় না এবং বিপদগ্রস্ত সকলকেই প্রাণে বাঁচাইয়া দেওয়া তাহাদের সাধ্যায়ত্তও নয়। বাঁচানো বা মারার নিশ্চিত বিধান আরও উচ্চস্তরের দেবদূতগণেরই কর্ম্ম। আমার এখন সে অধিকার নাই, কারণ প্রকৃতির গুহ্যতম নিয়ম ও সকল উদ্দেশ্যের সঙ্গে এখনও আমি সম্যক পরিচিত নহি। আমার এখন প্রাথমিক স্তরের কতকটা লইয়াই কর্ম্ম চলিতেছে কাজেই যেখানে কাহাকেও বাঁচানো বা মারার স্বাধীন ইচ্ছাপ্রসূত কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে হইবে সে সকল ক্ষেত্রে আমাদের মত একজনের কর্ম্ম করিবার পথ নাই, সেহেতু প্রেরণাও আসে না। তবে আমায় কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে পড়িয়া এ জ্ঞানটি স্বতই আসিয়া থাকে যে, যাহাকে বা যাহাদের লইয়া আমার কর্ম্ম তাহাদের উপর প্রাকৃতিক বিধানটা কিরূপ হইবে সেই অনুসারেই আমায় ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে হয়।

এ ক্ষেত্রে আমি দেখিলাম যে যুবার দেহত্যাগ অবশ্যম্ভাবী। পার্থিব

লোকের শরীর ও মন সম্পর্কে যেমন দয়া বা মমতা তাহার বশে তাহাদের কর্ম্মে ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি হয়, আমাদের সেরূপ কোনও মনোভাব নাই। প্রাকৃতির নিয়মেই এ ক্ষেত্রে তাহার যে গতি হইবে তাহাতে কিছু অন্তরায় থাকিলে সেটি দূর করিয়া তাহাকে নিজ গতিতে কতকটা অগ্রসর করিয়া দেওয়াই এখানে আমাদের কর্ম্ম। এখন দেখিলাম ইহার দেহত্যাগের কিছু বিলম্ব আছে, কারণ তাহার প্রাণ নিম্নমার্গের কেন্দ্রস্থল হইতে সঙ্কুচিত হইয়া প্রাণকেন্দ্রে এখনও গতিমান হয় নাই।

ষঠচক্রের ব্যাপার সম্বন্ধে যাঁহাদের জানা আছে তাঁহারা জানেন যে প্রাণ আপন কেন্দ্র অর্থাৎ উপর দিকে যেখানে মেরুদণ্ডের শেষ সেখান হইতে নিম্নে যেখানে মেরুদণ্ড শেষ হইয়াছে সেই পর্য্যন্ত অবিরাম অতি দ্রুত কম্পনের দ্বারা শারীরক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছে। তাহার ছয়টি কেন্দ্র আছে, প্রত্যেক কেন্দ্রের ক্রিয়া পৃথক ভাবের। নিম্নতম কেন্দ্র হইল গুহ্যদেশ, তাহার উপর লিঙ্গ, তাহার উপর নাভি, তাহার উপরে হৃদয়, তার উপরে কণ্ঠ, তার উপরে ভ্রূমধ্যে প্রাণকেন্দ্র। এই সকল কেন্দ্রই প্রাণের উপস্থিতি এবং সূক্ষ্মভাবে স্পন্দনের ফলে শরীর মনের যাবতীয় কর্ম্ম চলিতেছে। এখন মৃত্যুকালে দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে* প্রাণ নিম্নমার্গের সকল কেন্দ্র হইতে গুটাইয়া প্রাণকেন্দ্রে স্থির হয়, তারপর দেহত্যাগ করিয়া আত্মা সূক্ষ্ম শরীরে বিরাট ব্যোমে নিজ মার্গে গতি পাইয়া থাকেন। স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া গেলেও আত্মার একটি সূক্ষ্ম আবরণ তখনও থাকে তাহাকেই সূক্ষ্ম শরীর বলে!

এখন এই যুবা নিজের ভয়াত্মক কল্পনায় এমনই ভাসিয়া চলিয়াছে যে তাহার চৈতন্যের নাগাল পাওয়াই যায় না। অনেকটা, কানটা কাকে লইয়া গেল শুনিয়া কাকের পিছনে দৌড়ানোর মতই। এ অবস্থায় বেশীভাগ স্থুলবুদ্ধি জীবেরই এরূপ হইয়া থাকে। আমার এবার মৃত্যু হইবে জানিতে পারিলে তখন প্রকৃতিস্থ বা স্থির থাকাই কঠিন, কারণ অন্তর ক্ষেত্রে তখন ভূত ও বর্ত্তমান কর্ম্ম ও তাহার ফল

সংক্রান্ত হিসাব নিকাশ, এবং ভবিষ্যতে তাহার গতি কি হইবে এই সকল চিন্তার ঝড় বহিতে থাকে। দেখিলাম যুবার এত ভয় হইয়াছে যে, শান্তিময় অবস্থায় দেহত্যাগের পথ আপনিই রোধ করিয়া ফেলিতেছে। মধ্যে মধ্যে নানাপ্রকার বিকট মূর্ত্তি কল্পনা করিতেছে।

এ ক্ষেত্রে তাহার বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা অনুসরণ করিয়া এটুকু স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম যে, তাহার এই ভয় ও উদ্বেগের কারণটি এই যে, তাহার জীবনের সকল কর্ম্মই চঞ্চল বুদ্ধিপ্রসূত। তাহার প্রকৃতিই চঞ্চল। সুস্থ, বলবান শরীরে মনের চাঞ্চল্যই তাহাকে কর্ম্মের প্রেরণা যোগাইয়াছে। আর যে সকল কর্ম্ম সে করিয়াছে তাহাতে তাহার চৈতন্য পুষ্টিলাভ করিতে পারে নাই, স্থির সংযমের পথ পায় নাই। ধীর বিচারবান হওয়া ত দূরের কথা, সে কখনও কোন সময় একস্থানে চার দণ্ড স্থির হইয়া বসে নাই। অতিরিক্ত সঙ্গপ্রিয় ছিল তাহার প্রকৃতি, কখনও অল্পক্ষণের জন্যও নিঃসঙ্গ হইতে পারে নাই। তবে তাহার মধ্যে সরলতা ছিল। কুটিল কিম্বা দুষ্ট বুদ্ধি, অপরের অনিষ্টকারী স্বভাব তাহার ছিল না। অতিরিক্ত চঞ্চল প্রকৃতি বলিয়াই অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সুখপ্রিয়। যৌবনবিকাশের কিছুপূর্ব্ব হইতেই তাহার যৌন ক্রিয়ার প্রবৃত্তি জাগিয়া নানাপ্রকার সঙ্গ দোষে মনোভাব বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। ভালবাসা, প্রেম, এসকল তাহার মধ্যে স্থান পায় নাই। জীবনে তাহার মুখ্যত দুইটি কর্ম্ম প্রবল হইয়া ছিল, একটি তাহার নিরন্তর বন্ধু বা লোক সঙ্গ, দ্বিতীয় নারী সংসর্গ। ইহার জন্য তাহার কোন সৎ কর্ম্মবুদ্ধি জাগে নাই। অভাব, দুঃখ, সামাজিক বা গার্হস্থ্য জীবনের দায়িত্ব বোধ তাহার মধ্যে তিলার্দ্ধও স্থান পায় নাই। কাজেই এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে ক্ষীণ মস্তিষ্কে তাহার সংযমের অভাবই তাহাকে অতিরিক্ত পরিমাণে কাতর করিয়াছিল।

এ ক্ষেত্রে আমার কর্ত্তব্য হইল, উৎকট কল্পনাপ্রসূত বিষম আতঙ্কের অবস্থা হইতে তাহাকে স্থির বা শান্ত করা। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি,

কল্পনার বেগ এতটা প্রখর তাহাতে তাহার চৈতন্যের নাগাল পাওয়াই যায় না। পাগলের মত তাহার চৈতন্য উদ্দাম, বিপরীত মার্গেই গতিবিশিষ্ট। তখন অন্যদিক দিয়াই উপায় করিতে হইল।

তাহার আত্মীয়মণ্ডলের মধ্যে সকলেই মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল—এখন তাহাদের মধ্যে একজনের মনে হইল অনেকক্ষণ কিছুই খাওয়ানো হয় নাই, গলাটি বড়ই শুখাইয়াছে, একটু কিছু পান করানো যায় কি-না—দেখা যাক। তাহার কথা শুনিয়া সকলেই অনুমোদন করিল। এক পাত্র একটু জল লইয়া একজন তাহার চৈতন্যের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণের চেষ্টায় যখন অল্প একটু বাহ্য চেতনা আসিল, সে তখন ক্ষণেকের মত একবার চাহিয়া দেখিল,—আমি তাহাই চাহিতেছিলাম। যেই চক্ষু একবার খুলিয়াছে, বিকারের ঘোরে চাওয়ার মত, তাহার ঠিক সম্মুখেই ছিলাম, এবার আমি তাহার দৃষ্টির উপর শক্তি প্রয়োগ করিলাম; আমার প্রকাশ সে চৈতন্য দিয়াই অনুভব করিল।

ওকি? এ কে? শব্দগুলি যন্ত্রচালিতের মতই তাহার মুখ হইতেই বাহির হইয়া গেল। তারপর পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিল। তখন তাহার অন্তরে কল্পনার ভয় প্রশমিত হইল। তাহার আত্মীয়গণ তাহার কথা শুনিয়া একটু ভয় পাইয়াছিল তাহার, ও কি? এ কে? কে? কথাগুলি শুনিয়া তাহারা নানাপ্রকার ভয়াত্মক কিছু কল্পনা করিতে লাগিল, কিন্তু মুখে বলিল, কই, আর কেউ ত এখানে নেই, এই যে আমরা সকলেই তোমার কাছে আছি। খাও এই জলটুকু খাও,—বলিয়া জলটুকু খাওয়াইতে চেষ্টা করিল। সে চেষ্টার ফলে এখন সে কতকটা জলপান করিয়া তাহাতে অন্তরে বায়ুর গতি কতকটা স্থির হইল।

*

সেই যে একবার দেখা এখন সেই দৃষ্টিসূত্রে তাহার প্রকৃতি স্থির হইতে সহায়তা করিল। তাহার ভয় ক্রমে ক্রমে একেবারেই চলিয়া গেল। ভাবের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের গতিও স্থির হইয়া

আসিতে লাগিল। কল্পনার যত কিছু ভয়ের ব্যাপার আর কিছুই নাই, ক্রমে তাহার বড়ই আরাম বোধ হইতে লাগিল। সে বুঝিল নিঃসঙ্গ সে নয়। প্রিয়জন একটি তাহার সঙ্গেই আছে, ঠিক মানুষের মত তাহার শরীর দেখিতে পাইতেছে না বটে কিন্তু স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিতেছে। সে অনুভব স্থূল চক্ষে দেখার তুলনায় আরও নিকট, বেশী স্পষ্ট এবং ঘনিষ্ট। জ্ঞানে তাহার এখন আমায় লক্ষ্য হইয়াছে; সে বলিল, আমার কাছেই থাক, চলে যেও না,—এই কথা কয়টি বলিয়া ফেলিল।

শুনিয়া আশেপাশের নানা জনে নানা কথাই মনে করিল। তাহারা পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিতেছে, এ কথার কি অর্থ হইতে পারে; উত্তরে একজন বলিল, না না, এই যে, আমরা তোমার কাছেই আছি, ভয় কি?

ইত্যবসরে প্রাণের গতি কেন্দ্রের দিকেই নির্দ্দিষ্ট হইল, অন্তরের সকল চাঞ্চল্য আর নাই,—যুবকের দর্শন, স্পর্শ, শ্রবণ, এক হইয়া শান্তির আরাম স্থির ভাবেই অনুভূত হইতে লাগিল। হৃদয়ের শেষ স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের ঘন অনুভব,—তারপর বিহ্বলতা, তারপর সংজ্ঞা লোপ! এ অবস্থায় চৈতন্যকে জাগ্রত রাখিবার মত অহং তাহার ছিল না;—সাধারণের তাহা থাকেও না,—কাজেই, স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তিতে স্থিতির মত দেহত্যাগ সময়ে সে অচৈতন্য রহিল। এইখানেই আমার কর্ত্তব্য শেষ হইল।

একটি কথা জানিয়া রাখা ভাল যে,—সাধারণ জীব যারা অজ্ঞান অবস্থায় দেহত্যাগ করে। মমতা যাহাদের অধিক—দেহগত চৈতন্য যাহাদের স্তিমিত, তাহাদের দেহত্যাগের সময়ে মহাদ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। কিছুতেই সে প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী এই নিয়মে সহজে নিজেকে উৎসর্গ করিতে পারে না। মৃত্যুকে স্বীকার করিলেও তাহার যে সেই সময় এতটা নিকট হইয়াছে তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না, কোনও প্রকারে

যেন এড়াইতে চায়। যে দেহকে আধার করিয়া তাহার অহঙ্কারের স্ফুরণ হইতেছিল সেই দেহের উপরেই তাহার অধিকার ত্যাগ, একথা সে ভাবিতেও পারে না। কিন্তু তাহার সময় আসিলে তখন সেই অবশ্যম্ভাবী নিয়মের অনুবর্ত্তী হওয়া ছাড়া উপায়ও থাকে না। আখেরী হিসাব চুকাইবার সময় কৃপণের সঞ্চিত অর্থের সঙ্গে বিচ্ছেদের উৎকণ্ঠার মত—দেহাত্মবোধ যাহাদের প্রবল দেহত্যাগের সময়ে তাহাদের অবস্থা শোচনীয় হয়—সেই জন্যই তখন মূর্চ্ছা আসে, পরে সেই অবস্থাতেই তাহাদের শরীর ছাড়িতে হয়।

এ ক্ষেত্রে এই যুবকের যাহা ঘটিল, দেহ ত্যাগের পরে তাহার অবস্থার কথা কিছু বলা ভাল। দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মূর্চ্ছার ভাব কাটিয়া গেল। তখন তাহার শরীর এবং শরীরের সকল ক্রিয়ার মূল প্রাণের অভাব বোধ হইল। আমি আছি এ জ্ঞানটি আছে, মনের সংকল্প বিকল্পময় অবস্থা আছে, কিন্তু প্রাণের অভাবে তাহা ক্ষীণ, এতই ক্ষীণ যে তাহা হইতে ইচ্ছামত কর্ম্ম করিবার শক্তি এবং প্রবৃত্তির অভাব, যেমন তিন-চার দিন উপবাসের পর শরীরে প্রাণশক্তি ক্ষীণ হয়, সে সময় যেমন হালকা বোধ হয়, আকন্দ ফল পাকিলে তাহা ফাটিয়া যেমন অন্তরস্থ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তুলার গুচ্ছ সকল বাতাসের গতি অবলম্বন করিয়া ভাসিয়া বেড়ায়, দেহচ্যুত এই জীবের গতিও সেইরূপ,—তখন তাহার কর্ম্মানুসারী গতিতে নিজ অভিষ্ট মার্গে গতিমান হয়।

জীবিত অবস্থায় যে ধারায় তাহার কর্ম্ম চলিয়াছিল, প্রত্যেক কর্ম্মের ফলাফল বিষয়ে তাহার যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়াছে,—সেই সকল অভিজ্ঞতাই তাহার গতি। এখন প্রাণশক্তির অভাব হইলেও তাহার সেই ক্ষীণ জ্ঞানই তাহাকে তাহার নিজ মার্গ আধিকার করিতে সহায়তা করিতে থাকে। অন্তরের চৈতন্য, কর্ম্মবিপাকে মলিন থাকিলে এই পরলোকে তাহাকে কতকটা অন্ধকার দেখিতে হয়,—কিন্তু বিবেকের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ক্রমে ক্রমে তাহার জড়বুদ্ধি যত পরিস্কৃত হইতে থাকে

ততই অর্থাৎ সেইক্রমে সে নিজের পথে আলোক দেখিতে পায়। এই যুবকের তাহাই হইয়াছিল। যতক্ষণ তাহার নিজ মার্গ সরল, আলোকময় না হইল ততক্ষণ আমাকে প্রচ্ছন্ন ভাবেই তাহার সাথে সাথে থাকিতে হইল। ইহাও সত্য যে তাহার দেহত্যাগের পর, যতক্ষণ তাহার পার্থিব জড়তাময় অসহায় ভাবটি না কাটিল ততক্ষণ তাহার বিচারবুদ্ধির উপর আত্মশক্তি বিকাশের ফলে নিজ মার্গে গতিমান করিতে সহায়তাই করিতে হইয়াছিল। অন্তরীক্ষের সৌর দেবদূতগণের ইহা অন্যতম প্রিয় কর্ম্ম। যাঁহারা এ জড় জগতের জড় ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সর্ব্বদাই লোকসঙ্গে জীবন যাপন করেন, মৃত্যুকে তাঁহাদের প্রধান ভয়ই নিঃসঙ্গতাঘটিত। তাঁহাদের কল্পনা এই ভাবেই পুষ্ট হয়, যেন দেহত্যাগের পরের অবস্থা কেবল অন্ধকারে নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকা,—তাহাদের জন্যই আমার এই সত্যটি প্রকাশ করিতে হইল।

৬

এবার আর একটি ঘটনার কথা,—তারপর কর্ম্মক্ষেত্র পরিবর্ত্তনের কথা বলিব। ব্যাপারটি হিমালয়ের মধ্যে ভোটরাজ্যের এলাকায় একস্থানে ঘটিয়াছিল।

ভোটিয়া স্ত্রী, পুরুষ ও একটি বালক-পুত্র। পিতা-পুত্রের পৃষ্ঠে মোট বাঁধা; অবশ্য যে যতটা পারে সেই মতই, নারীর পিঠে ছোট একটি কাপড় চোপড়ের বোঝা। আরও একটি সঙ্গী তাহাদের আছে, একটি পাহাড়ী গাধা, তার পিঠে দুই দিকেই বেশ ভারী মাল চাপাইয়া বেশ প্রফুল্ল মনে তাহারা চলিয়াছে। চল্লিশটি ক্রোশ চড়াই, উৎরাই এবং গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া তাহারা যেখানে যাইতেছে, এই সময়ে সেখানে প্রতিবৎসরেই একটি মেলা বসিয়া থাকে, অনেক টাকার কেনা-বেচা হয়। সারা বৎসর পরিশ্রম করিয়া ইহারা যে-সকল দ্রব্য উৎপন্ন করে এই হাটেই তাহা বিক্রয় করে। শেষে ফিরিবার সময় কিছু কিছু কাঁচা মাল সওদা করিয়া আনে যাহাতে আবার সারা বৎসর কাজ চলিবে। এই তাহাদের জীবিকা। সরল, সুন্দর, স্বাস্থ্যপূর্ণ জীবন তাহাদের।

এখন যে-পথে তাহারা চলিয়াছে সে-পথে পড়াও বা আশ্রয় স্থান কিছু দূরে দূরে। এ অঞ্চলে এমনই হয়। সঙ্গে তাহাদের চাল, ডাল, আটা, ঘি, গুড় প্রভৃতি আহার্য্য দ্রব্যাদি চলিতেছে। আজ সকালে তাহারা আহারাদি সারিয়া মধ্য পথের একটি জঙ্গলময় পড়াও হইতে বাহির হইল, পাঁচ ক্রোশ গেলে তবে আবার আশ্রয় মিলিবে।

ক্রোশ দুই চলিবার পর পুরুষটি, পেটের পীড়া অনুভব করিয়া বোঝা রাখিয়া জঙ্গলে গেল। মাতা-পুত্রে বোঝা নামাইয়া ততক্ষণ একটু বিশ্রামের জন্য বসিল। অনেকক্ষণ পর যখন সে ব্যক্তি ফিরিয়া

আসিতেছে দেখা গেল, তাহার চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, চলৎশক্তি ক্ষীণ। নারী উদ্বিগ্ন চিত্তে অগ্রসর হইয়া ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিতে সে কেবল মাত্র,—হৈজা, এই কথাটি বলিয়া, সেইখানেই বসিয়া পড়িল। ওলাউঠা বা কলেরাকে ইহারা হৈজা বলে, এ রোগে মৃত্যু নিশ্চিত ইহাই তাহাদের ধারণা।

শুনিবামাত্র ভয়ে নারীর মুখ শুখাইয়া গেল। তাড়াতাড়ি পুত্রকে ডাকিয়া দুজনে গাধাটি ভারমুক্ত করিল। বোঝা হইতে বিছাইবার মত একটা কিছু বাহির করিয়া নারী স্বামীকে ভাল করিয়া শোয়াইয়া দিল। পথের পাশে, পীড়িত স্বামী লইয়া এইরূপ অসহায় বিপন্ন নারীপ্রাণে যে অবস্থা তাহা বর্ণনার ভাষা নাই। তাহার মুখ দিয়া কথা ফুটিল না। উদ্বেগ, ভয়, ও বিষাদ, মিলিয়া স্বামী-স্ত্রী উভয়েই মুহ্যমান, বালকটি এখনও বিপদের কথা ভাল বুঝিতে পারে নাই। সে একবার পিতা ও একবার মাতার মুখের দিকে দেখিতে লাগিল। জনশূন্য জঙ্গলময় পার্ব্বত্য পথে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, যদি কেহ আসে, কিন্তু কে কোথায় আছে যে সাহায্য করিতে আসিবে?

নারীহৃদয় বিধাতার কি অপূর্ব্ব রহস্যময় সৃষ্টি,—এমনই তাহাদের গঠন, গুরু বিপদে অসহায় বিপন্ন অবস্থাটি তাহারা এমনই তীক্ষ্ণ অনুভব করিতে পারে পুরুষে ততটা পারে না। ঐ অবস্থায় তাহারাই সহজে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে পারে,—স্বভাবত পুরুষার্থ প্রবল পুরুষের যেটি সহজে ঘটিবার নয়; কারণ সম্পূর্ণ শক্তিহীন না হইলে পুরুষ আত্মসমর্পণ করিতে পারে না। কখন কখন নিজ শক্তিতে বিশ্বাসের অভাবে তাহারা ভগ্ন হইয়া পড়ে, সে ক্ষেত্রে আত্মসমর্পণও ঘটে না আর পুরুষার্থ-প্রয়োগেও শক্তিহীন। নারী, এ সব ক্ষেত্রে, সহজ আত্মসমর্পণের প্রভাবে যে কল্যাণ আকর্ষণ করিয়া আনে, পুরুষ তাহার পূর্ণ অংশই গ্রহণ করে কিন্তু তাহাদের ধারণাতেও আসে না কিভাবে এটি সম্ভব হইল। এই পৃথিবীর সকল মনুষ্য সমাজেই এই

ভাবে নারী জাতি অশেষ কল্যাণময়ী অথচ পুরুষের ধারণা, নারী দুর্ব্বল এবং জন্মগত অধীনতা লইয়া তাহাদেরই সেবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে।

যথানিয়মে এখন তাহাদের এই ব্যাকুল আর্ত্তি, বিশেষত নারী-প্রাণের গভীর বিষাদ এবং কাতর প্রার্থনা, সেই জনশূন্য পার্ব্বত্য অরণ্য ভেদ করিয়া যথাস্থানে পৌঁছিল এবং ঐ ক্ষেত্রে যেরূপ সাহায্য প্রয়োজন তাহার যোগাযোগও ঘটিল।

সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পীড়িত ব্যক্তি তৃষ্ণায় কাতর। কণ্ঠ শুখাইতেছে দেখাইয়া স্ত্রীকে বলিল,—বড় তৃষ্ণা, একটু জল। স্ত্রী ভাবিল, সর্ব্বনাশ! তবে ত রক্ষা নাই। এ রোগে রোগীকে জল দিতে নাই, জলপান করিলেই রোগীর মৃত্যু অনিবার্য্য ইহাই তাহার ধারণা। শুধু তাহার নয়, এই হিমালয় রাজ্যে সর্ব্বস্থানেই এই সংস্কার বদ্ধমূল। সুতরাং যদিও সে বলিয়া ফেলিল যে, জলে এখন কাজ নাই, খারাপ হইবে—কিন্তু আমার উপস্থিতির প্রভাব তাহার অন্তঃকরণে অর্থাৎ বুদ্ধির উপর যে ক্রিয়া করিল তাহার ফলে সে ভাবিল যখন এতটাই তৃষ্ণা, তখন জল, পাহাড়ে ঝরনার পরিষ্কার জলপান করিলে তাহার হয়ত উপকারই হইবে। তারপর নিজেও তৃষ্ণা অনুভব করিয়া বালককে জল আনিতে বলিল। তারপর, রোগী ছটফট করিতেছে দেখিয়া সে তাহার বুকে, মাথায়, হাত বুলাইতে লাগিল। অন্য সময় হইলে সে তাহাকে ছুঁইত না, দূরে থাকিয়া যাহা করিবার তাহা করিত।

জল ছিল কিছু দূরে, বালকের জানা ছিল না। এখন তাহাকে পথ দেখাইতে হইল। জল পাইয়া সে প্রথমে নিজে যতটা পারিল পান করিয়া লইল, তারপর পাত্র ভরিয়া লইয়া আসিল। অন্য সময়ে এই ভোটিয়ারা জল পান করে না,—তাহারা মদ্য পান করে। এক প্রকার মদ তাহারা ঘরে প্রস্তুত করে, সংসারের সকল কর্ম্মের মধ্যে ইহাও তাহাদের নৈমিত্তিক কর্ম্ম। তৃষ্ণা অনুভব করিলে জলের পরিবর্ত্তে তাহাই পান করিয়া থাকে। এ অঞ্চলের শীতপ্রধান দেশে

জলে বড়ই ভয়—সর্দ্দি লাগিয়া যাইবে। সেই জন্যই রোগের সময়ে প্রকৃত জলের তৃষ্ণা যখন পায় তখনও জলকে বিষবৎ এড়াইতে চায়। যাহা হউক, এখন বালক জল আনিয়া তাহার জননীকে সেখানে দেখিতে পাইল না। পিতার নিকট পাত্র ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল মা কোথা? রোগী আগে জলতৃষ্ণা মিটাইয়া পরে অঙ্গুলী সঙ্কেতে জঙ্গলের দিকে দেখাইয়া দিল। চাহিয়া দেখিল তাহার মা আসিতেছে, মুখে বিষাদের ছায়া।

জননীকেও রোগে ধরিয়াছে,—পুত্র অগ্রসর হইয়া তাহার কাছে গেল। ধীরে ধীরে তাহার মা পিতার নিকটে আসিয়া বসিল এবং তাহাকে ছুঁইতে নিষেধ করিয়া বলিল, আর রক্ষা নাই, একটু জল দাও। পাত্রটি ছোট, পিতাই সবটা শেষ করিয়াছে, কাজেই বালক আবার ছুটিল জলের উদ্দেশ্যে আর তাহার মা সেইখানে শুইয়া পড়িল। এই পাহাড়ে, হৈজাকি বিমার যখন ধরে তখন এই রকমই হয়। পুনরায় যখন বেগ আসিল, তখন আর তাহাদের উঠিয়া জঙ্গলে যাইতে শক্তি নাই। পড়িয়া পড়িয়া তাহারা সেই বিষম রোগ ভোগ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মাছিতে সে স্থান পূর্ণ এবং তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া গেল। সূর্য্যদেব তখন মাথার উপর।

দুর্গম জঙ্গলে পথের মধ্যে তাহাদের এই অবস্থা। পুরুষের অন্তরে মৃত্যুভয় আছে। নারীর তাহা নাই, সে দেবতার অনুগ্রহের উপর সব ছাড়িয়া দিয়াছে। মাঝে মাঝে সন্তানের কথা ভাবিতেছে বটে তবে দেবতা যা করেন, ভাবিয়া অনেকটাই সে নিশ্চিন্ত; কিন্তু পুরুষটি তাহাদের গাধা, মাল এবং বালকটির কি হইবে এই সকল ভাবিয়া বড় ছটফট করিতেছে। এখন কি ভাবে ইহাদের পরিণতি ঘটিল তাহাই বলিব।

যে পড়াও হইতে ইহারা বাহির হইয়াছিল,—দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্ব্বে খুলনা অঞ্চলের দুটি বাঙ্গালী যুবক সেখানে আসিয়া পৌঁছিল। একজন

পাহাড়ী বাহক তাহাদের মালপত্র লইয়া সঙ্গে ফিরিতেছে। দুজনের হাতেই বন্দুক। তবে শিকার তাহাদের উদ্দেশ্য নয়, পায়ে হাঁটিয়া হিমালয়ের সবটা ভ্রমণ করিবে এই উদ্দেশ্যেই মাসাধিক কাল ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে এক জন চিত্রকর, দ্বিতীয় যুবক বড় খেলোয়াড়।

তাহারা ভোরে উঠিয়াই যাত্রা করিয়াছিল, উদ্দেশ্য, আজ রাত্র এখানে কাটাইবে, স্থানটি উপভোগ করিবে ; কাল ভোরে আবার যাত্রা করিবে। এই ভাবেই তাহারা আনন্দে হিমালয় ভ্রমণ করিতেছিল। এখানে পৌঁছিবামাত্র যে ব্যক্তি শিল্পী তাহার মনে স্থানটির উপর একটা বিতৃষ্ণভাব দেখা গেল। বন্ধুকে বলিল, জায়গাটা ভাল নয়, ভয়ানক জঙ্গল—চল খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে—কি বল।

বন্ধুর আজই যাইতে আপত্তি ছিল কিন্তু সে জানিত তাহার আপত্তিতে কাজ হইবে না, কারণ দুজনের মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় ছিল। তবুও বলিল, আজ এখানে থাকাই যাক না, দশ মাইল হেঁটে আসা গেল আবার এখনি যাবে ? উত্তরে তাহার বন্ধু বুঝাইল যে, এস্থানটি জঙ্গল, মোটেই থাকিবার উপযুক্ত নয়, চল না যাওয়াই যাক। যদি ও জায়গাটা ভাল হয় সেখানে না হয় একটু বেশী থাকা যাইবে। মোটে ত নয় মাইল, আমরা সন্ধ্যার ঢের আগেই পৌঁছাইতে পারিব।

তাহারা যাইবে ঠিক করিল বটে কিন্তু কুলীটা আরাম চায়। সে মালপত্র রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে কাঠ সংগ্রহের চেষ্টায় বাহির হইয়াছে। ফিরিয়া আসিলে দুজনে মিলিয়া তাহাকে বুঝাইতে লাগিল, মোটে সাড়ে চার ক্রোশ পথ, আহারাদি সারিয়া বাহির হইলেও আমরা বেলা থাকিতেই পৌঁছাইতে পারিব। সে কিছুতেই রাজী হয় না দেখিয়া, তাহাকে কিছু অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় তখন রাজী হইল।

বেলা যখন তৃতীয় প্রহর ঘেঁষিয়াছে, তখন তাহারা যথাস্থানে

আসিয়া পড়িল। পথের পাশে প্রথমে বালকটিকে, পরে রোগে অচৈতন্যপ্রায় স্ত্রী-পুরুষ লক্ষ্য করিয়া তাহারা সেখানে দাঁড়াইল, কুলী একটু পিছাইয়া পড়িয়াছিল।

বালক তাহাদের দেখিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে তাহার পিতামাতার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া যাহা বলিতে লাগিল আগন্তুক দুজন তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। তবে একথা সহজেই বুঝিল যে, ইহারা রোগগ্রস্ত, অসহায় এবং বিপন্ন। রোগীর নিকটে গিয়া অবস্থা দেখিল, হিন্দীতে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া অবস্থাটা কতক জানিয়া লইল, কেবল, হৈজা কথাটির অর্থ বুঝিতে পারিল না। মলের দুর্গন্ধ, সেখানে মাছি ভয়ানক। এই সকল দেখিয়া তাহারা অনুমান করিল হয়ত-বা ইহাদের কলেরাই হইয়াছে। চক্ষু দেখিল ঘোর রক্তবর্ণ; বিকারের লক্ষণ বুঝিয়া তাহারা চিন্তিত হইল। বলা বাহুল্য, তাহাদের আর যাওয়া হইল না।

আগন্তুক যুবকদের দেখিয়া স্ত্রী-পুরুষ এবং বালক—সকলের প্রাণেই ভরসা আসিয়াছে। স্ত্রী-পুরুষে জড়িতকণ্ঠে কত কি বলিতে লাগিল কিন্তু তাহাদের কুলী না আসিয়া পৌঁছাইলে কিছুই করা যাইবে না বুঝিয়া পথের দিকে দেখিতে লাগিল। চিত্রকর আগাইয়া গেল দেখিতে, দ্বিতীয় যুবক বালককে জিজ্ঞাসা করিল, জল কোথায় পাওয়া যায়? তাহাদের সঙ্গে একটা তামার কলস ছিল, বালককে জল ভরিয়া আনিতে পাঠাইয়া দিল। তাহারা মলের দুর্গন্ধ পাইয়াও ঘৃণা করিল না।

চিত্রকরের মনে তখন নিশ্চিত ভাবে এই কথাটাই উঠিতে লাগিল যে, রোগগ্রস্ত বিপন্নদের সাহায্যের জন্যই তাহাদের আজ সেখানে থাকা হইল না, আর ভগবান এই জন্যই তাহাদের এখানে পাঠাইয়াছেন। তার মনে আশঙ্কাও ছিল যে, এ-ক্ষেত্রে তাহারাই বা কি করিতে পারিবে। ইহারা বাঁচিবে কি-না সন্দেহ—বালকেরই বা কি হইবে;

এই সব? যাই হোক, কর্ত্তব্য যেটুকু তাহারা সেইটুকু ত করিতে পারিবে! আবার সাহসও আসিতেছিল এই ভাবিয়া যে, ভগবান যখন তাহাদের আনাইয়াছেন তখন অবশ্যই ইহাতে একটা শুভ উদ্দেশ্য আছে।

কিন্তু তাহারা কি করিয়া জানিবে কোন্ ভগবান তাহাদের এখানে আনিয়াছেন, আর কি উদ্দেশ্যই বা তাঁহার আছে ইহার মধ্যে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সৌর দেবদূতগণের কাজ মানুষের চৈতন্য বা বিবেক উদ্বোধিত করা। সরলবুদ্ধি যাহারা তাহাদের উপর দেবদূতের প্রভাব বেশী এবং শীঘ্র কার্য্যকরী হয়। তীক্ষ্ণ বিবেকবান যাহারা তাহাদের উপর কোন প্রভাব বা শক্তির প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না, সান্নিধ্যেই অভিপ্রেত কর্ম্ম উৎপন্ন হয়। এ ক্ষেত্রে আমার কর্ম্ম ছিল দূরবর্ত্তী যুবকদ্বয়ের সঙ্গে এই বিপন্ন যাত্রিগণের যোগাযোগ ঘটানো; তাহাদের সহিত মিলাইয়া দিলেই এ ক্ষেত্রে কল্যাণ হইবে। তাহারা সরল উন্নতমনা বলিয়া সহজেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া গেল। নতুবা রোগীদের বাঁচাইতে আমার কোন হাত নাই, সে কর্ম্ম আমার নয়। এখানে দেখিলাম স্ত্রী বা নারীর মৃত্যু অনিবার্য্য, পুরুষ বাঁচিবে, কিন্তু আমার দরদ তিনটি প্রাণীর উপর সমানই, ইতর-বিশেষ কিছুই নাই, থাকা আমাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। যাহা হউক, এই দুই পর্য্যটক বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে সাহস, উৎসাহ, ত্যাগ এবং পরোপকার প্রবৃত্তি থাকার জন্য কাজটি সহজ হইয়া গেল। পূর্ণ আস্থা এবং প্রীতি সহকারে তাহারা এই দৈবনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে লাগিয়া গেল। ইহাতে তাহাদের উপকার কম হইল না। মহত্ব বা মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে এই সকল কর্ম্মই বিশেষ সহায়তা করে।

শুভ কর্ম্মে ব্যাঘাত বিস্তর, এ যেন একটা প্রতিজ্ঞার মতই। এ কাজে তাহারা বাধাও কম পায় নাই। তাহাদের সেই বাহক আসিয়া যখন ব্যাপার দেখিল, বুঝিল, তখন বিষম ভয়ে সে দূরে

চলিয়া গেল। দূর হইতে জোড় হাতে সে যুবকদ্বয়কে রোগীর কাছে যাইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে লাগিল। বিপদের ভয় দেখাইতে লাগিল। তাহার অনুনয় বিনয় দেখিয়া একজন বন্দুকটি তুলিয়া লইল এবং বাহকের দিকে লক্ষ্য করিয়া জানাইল যে, এখন কথার অবাধ্য হইলে এই বন্দুকের গুলিতে তাহার প্রাণ যাইবে। প্রাণের ভয় সকল ভয়ের বড়, সুতরাং বাহক এখন বশীভূত হইল।

তখন বাহকদ্বারা যে কাজ সম্ভব তাহা করানো হইল। জল আনাইয়া রোগীদের পরিষ্কৃত করিয়া, বস্ত্রাদি পরিবর্তন এবং শয্যায় শয়ন করানো হইল। মোটামুটি কিছু ঔষধ তাহাদের সঙ্গে যাহা ছিল বুদ্ধি পূর্ব্বক তাহা সেবন করান হইল। দুজনে মিলিয়া এই দুর্গমে অপরিচিত রোগীদের জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিচারে যথাসম্ভব সেবা করিতে লাগিল। এইভাবে সে রাত্র তাহারা রোগীদের নিকটে কাটাইল। কিন্তু রক্ষা পাইল পুরুষটি। নারীকে বাঁচাইতে পারিল না ভাবিয়া তাহারা গভীর দুঃখ পাইল বটে কিন্তু ভবিতব্য ভাবিয়া শান্ত হইল। নারীর প্রাণশক্তি ছিল না, পুরুষের কল্যাণে সে সবটাই নিঃশেষ করিয়া দিয়াছিল।

যাহা হউক, স্ত্রীকে হারাইয়া পুরুষের দুর্ব্বল শরীরে যে আঘাত লাগিল তাহা সামলাইতে তাহার কয়েক দিন গেল। যুবকদ্বয়—নারীকে মৃত্যু পর্য্যন্ত যথাকর্ত্তব্য সেবা করিয়া পরে কুলির সাহায্যে গতি করিল এবং যত দিন না পুরুষটি সবল হইল ততদিন তাহারা ঐ খানেই রহিল। পরে যখন পুরুষের চলিবার মত অবস্থা হইল, তখন তাহারা একসঙ্গে চলিল এবং তাহাকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া পরমানন্দে নিজেদের নির্ব্বাচিত পথে প্রস্থান করিল।

পরলোকের যা-কিছু, ইহলোকের অ-দৃষ্ট। কারণ দেহত্যাগের পর আর সেই জীবের গতাগতি ইহলোকের কারো ইন্দ্রিয়-গোচর নয়। অথচ মানুষ-সমাজের অনেকেরই জানিতে ইচ্ছা হয়, ঐ অবস্থার কথা

অর্থাৎ দেহত্যাগের পর কি প্রকার গতাগতি হয়, ওখানকার কথা এখানে জানা কঠিন শুধু নয়, ধারণা করাও কঠিন, আবার যারা জানে তাঁদের পক্ষে প্রকাশ করাও কম কঠিন নয়। সেই জন্যই মনে হয়, অ-দৃষ্ট থাকাই ইহার বিধিবদ্ধ সর্ব্বোত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু আমরা মানুষ, নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল আমাদের না খাইলেই নয়। তবে তাহাতে লাভ কি, যদি হিসাব করিয়া দেখা যায় তাহা হইলেই দেখিব, যেখান হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম, সেস্থান হইতে বড় বেশি দূর যাওয়া হয় নাই, তবে মনে হয় যেন অনেকদূর আসিয়াছি বা অনেকটাই বুঝিয়াছি। তবে এটা সাধারণ পল্লবগ্রাহী বুদ্ধির বা সাধারণ অধিকারীর কথা। যাঁরা এই ভাবের পশ্চাতে বুদ্ধি ও মনের সর্ব্বাংশ নিয়োগ করতে পারেন তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা যোগী, যোগীর কাছে প্রকৃতির সকল গুহ্যই উন্মুক্ত হইয়া যায়।

এখন জীবের ভালবাসা বা প্রেম লইয়াই একটু কথা আছে। সাধারণত ভালবাসা এক প্রবল যৌগিক ব্যাপার। এক হৃদয়ে তাহার জন্ম, পরে তাহা আপন শক্তিতে প্রসারিত হইয়া বিশ্বজগতে মানব-সমাজে ছড়াইতে পারে যদি উহা স্বার্থলেশশূন্য হয়। নর ও নারীতেই ভালবাসা হয় এইটাই সাধারণের ধারণা, কিন্তু আসলে উহা সর্ব্বজীবেরই সম্পত্তি। নর-নারী, নরে নরে, নারীতে নারীতেও উহা ঘটিতে পারে। তবে যেখানে জীবসৃষ্টির প্রয়োজন সেখানে নিশ্চয়ই উহা নর ও নারীর মধ্যেই জন্মায়। সাধারণত মানুষ-সমাজে উহা স্বার্থের সঙ্গেই মেশানো থাকে, আর এমন ভাবেই থাকে যেন স্বার্থ হইতে তাহার অস্তিত্বকে পৃথক করাই যায় না। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই উহা ওতঃপ্রোত জড়িত থাকে, আমরা সহজে দেখিতে পাই।

একই সময়ে এক হৃদয় হইতে অপর হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতে পারে এই বিচিত্র আকর্ষণ। ঐ প্রেম, উহার প্রভাবে অসাধ্যও সাধ্য হইতে পারে। কিন্তু উহার আসল তত্ত্বই হইল প্রসারমুখী আকর্ষণ। বিবাহিত

জীবনে স্ত্রী-পুরুষ মিলনের ফলে সৃষ্টি, এই ক্রমে এক হইতে দুই, তারপর বহু হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। এ ধারা সঙ্কীর্ণ, কিন্তু প্রেমতত্ত্বটি ব্যাপক। প্রেম না বলিয়া এখানে ভালবাসা কথাটাই ব্যবহার করা ভাল, কারণ যে সম্পর্কে উহার পরিচয় এখানে বলিতেছি তাহা সন্তান ও জননীর বিষয়।

সবাই জানে, কোন কোন জননীর একমাত্র সন্তানের উপর মমতা অসাধারণ,—অনেক মা সন্তানের জন্য দেহত্যাগ পর্য্যন্ত করিয়াছে। এই যে টান এ বড় সহজ নয়। ইহজগতের এই স্থুল সংসারে এই যে অসাধারণ টান, দেহত্যাগের পর এ কি সবই শেষ হইয়া যায়? সাধারণের মনে যাহাই হউক না কেন, আসলে এ টান মোটেই পার্থিব নয়। ইহার গতি অনেক দূর। তার একটি সূক্ষ্ম কারণ আছে। ঐ যে একটি আত্মার অপর একের প্রতি অসাধারণ টান, ফলে দুইটি সত্তার গতি এক হইয়া যায়। কিন্তু দেহ ভেদ হইলে আগে একজনের মৃত্যু হইলে অপরের কি গতি হয়? গভীর হইলে অন্য জনেরও দেহ রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া ওঠে। এখানে ব্যাপারটা ছিল অন্য প্রকার।

যাহা হোক এখন, আগে যে নারীর দেহত্যাগের কথা বলিয়াছি তাহার সম্বন্ধে আরও একটু বলিবার আছে। ইহাতেই বুঝা যাইবে যে, এক শ্রেণীর মাতৃ সম্পর্কের প্রসার এবং জননীর ভালবাসা পরলোক হইতেও ইহলোকে সন্তানের উপর কিভাবে কল্যাণকর হয়। কিন্তু সন্তান বিপরীত ধর্ম্মী হইলে সেই সন্তান জননীর ঊর্দ্ধগতির হন্তাও হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে দেখা গেল, জননীর যতটা ভালবাসা সন্তানের উপর ছিল, সন্তানের ততটা ছিল না। এই কারণে পুত্র সন্তানটি, মায়ের মৃত্যুর পর কিছু কাল মোহগ্রস্ত হইয়াই রহিল।

নিঃস্বার্থ প্রেমে পূর্ণ জননী প্রথমে নিজ ভাবে উচ্চ মার্গেই চলিতে-ছিলেন কিন্তু সন্তানের প্রতি মমতার বশে আবার নামিয়া সন্তানের প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলেন। এইভাবে তাঁহার উচ্চ মার্গে গতির তাল ভঙ্গ

হইতেছিল। এ ক্ষেত্রে আমার কর্ত্তব্য আছে অনুভব করিলাম। আর সে কর্ত্তব্য হইল জননীকে সন্তানের স্বাধীন গতি সম্বন্ধে সচেতন করা।

সন্তান কতক্ষণ বাপ-মাকে চায়? যতক্ষণ না তাহার স্বতন্ত্র ভোগ জীবন গড়িয়া উঠে। ক্রমে যৌবনের প্রভাবে সে পিতামাতার আকর্ষণ কাটাইতে আরম্ভ করে। পরে তাহার স্বতন্ত্র অস্তির ও প্রবৃত্তি সকল ফুটিতে আরম্ভ করিলেই আকর্ষণটা বিশেষরূপেই কাটাইতে পারে। তারপর সে যৌন সম্বন্ধ পাতাইতে সচেষ্ট হয় এবং যখন তাহার পরিণামে পুত্রের পিতা হয় তখনই সে তাহার জনক-জননীর স্নেহপাশ ছিন্ন করিতে পারে। শাস্ত্রে তাহাকে পিতৃঋণ শোধ বা মুক্তি বলে। কিন্তু মাতৃঋণ পরিশোধের কোন কথাই নাই। কারণ বিশ্বস্রষ্টা প্রকৃতি জননী মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্বন্ধটি এমনই সুকৌশলে গাঁথিয়াছেন যে, উহার শেষ বা ছেদ হয় না, সুতরাং পরিশোধের দাবি রাখে না। মায়ের উপরে সন্তানের টান না থাকিলেও অধিকাংশ মায়ের তাহা থাকে, ছেদ হয় না, সেই জন্য অনেক সময় জননী পরলোকে গেলেও সন্তানের কথা ভুলিতে পারে না। কারণ সে যে তাঁরই সৃষ্টি এবং এক সময়ের অবলম্বন।

যাহা হউক, এ ক্ষেত্রে, ক্রমে ক্রমে সেই প্রেমপূর্ণ জননীর নিজগুণেই তাহার সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবনের কতকাংশ চৈতন্যগোচর হইল। তিনি কারণ দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন, সন্তান তাহার প্রতি ততটা আকৃষ্ট নয়। ভবিষ্যতে তাহার সমাজের আর পাঁচজনের মত সে কর্ম্মঠ এবং ভোগবিলাসী হইতে চলিয়াছে। তখন অবস্থানুসারে তাহার কথা ভুলিয়া যাইবে। সন্তানের হৃদয়ে মায়ের জন্য কোনোরূপ আকর্ষণই থাকিবার নয়। এই সকল সহজ নিয়মেই ঘটিয়া চলিবে।

যেই মাত্র জননীর-নিজ সন্তানের পরিণাম চৈতন্যগোচর হইল, তখনই তিনি সহজ সাম্যভাবে অনুকূল অবস্থাপাইলেন; ক্রমে নিজ মার্গে ঊর্দ্ধগতি পাইলেন। কিন্তু সন্তানের অশেষ কল্যাণ কামনা, যাহাতে

ভবিষ্যতে বিপদে আপদে সে সহজে উদ্ধার পাইবে এবং তাহার জীবন বিঘ্নসঙ্কুল না হইয়া সহজ হইতে পারে—এমনই একটি শুভ, কল্যাণ কামনার ধারা বা প্রবাহ রাখিয়া গেলেন।

রাখিয়া গেলেন,—বলিয়া যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছি তাহা বুঝাইতে জটিল না হয় সেইজন্য এই কথাটি আবার প্রয়োজন বুঝিয়াই বলিতেছি যে, তাঁহার পবিত্র লঘু ( অস্তিত্বময় ) সত্তা হইতে, তাহার সন্তানের শুভ হোক, এই কামনার একটি সূক্ষ্ম প্রবাহ জীবন-কেন্দ্র লক্ষ্য করিয়া স্পন্দিত হইতে লাগিল, তাহাতেই সেই জীবের প্রভূত কল্যাণ নিহিত, আর এইভাবেই এখানকার জীব পরলোকগত আত্মীয়ের শুভইচ্ছা বা আশীর্ব্বাদ পাইয়া থাকে এবং তাহাতে তাহার জটিল জীবন অনেকাংশেই সরল ও শেষে কৃতার্থ হয়।

এখানে আরও একটু কথা জানিয়া রাখা ভাল যে ইন্দ্রিয় সতেজ থাকিলে, কর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল অনুভূতি স্পষ্ট হয় বা জীবিতকালে কর্ম্মাবস্থায় যেমন ভাবে মানুষের হইয়া থাকে, যে সকল ভাব বা বিষয় প্রাণে, মনে ও বুদ্ধিতে জীবন্ত ভাবে ধরা দেয়, পরলোকগত জীবের দেহমুক্ত অবস্থায় সেরূপ সতেজ অনুভূতির সম্ভাবনা না থাকিলেও তাহার অন্তরের কামনাসমূহ ইহজগতের তুলনায় সাধারণত যতই ক্ষীণ মনে হোক না কেন তাহার ক্রিয়াশীলতা কখনও প্রতিহত হয় না, বরং গভীর ভাবেই ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। কারণ অন্তরীক্ষের সূক্ষ্মভাব-সমূহের অবাধ গতাগতির অবকাশ আছে। আরও কথাটা এই যে, ভাগ্যবান জীব, জীবিত অবস্থায় যাঁরা প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছেন, অর্থাৎ যৌন-প্রবৃত্তির তাড়না-মুক্ত যে সরল প্রেম, নির্ম্মল স্বার্থলেশহীন ভালবাসার আস্বাদ যাঁরা পাইয়াছেন,দেহ মুক্ত হইলে তাঁহাদের উৰ্দ্ধগতি ও অনুভূতি বহুদূর প্রসারিত হয়। সৃষ্টিতত্ত্বে মানব-প্রকৃতি এবং তাহার গতি সম্বন্ধে সহজ জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি তাহাকে অশেষ শক্তিশালী করিয়া তুলে। এক কথায়, তাঁহারা যথার্থই কতকাংশে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন।

এই সূত্রেই হিন্দুদের দেহত্যাগের পর কারো নাম উল্লেখ করিতে সেই নামের আগে ঈশ্বর ৺ চিহ্ন নির্দ্দেশের বিধি। জীবের জীবনে ভবিষ্যৎ গতি সম্বন্ধে সকল ব্যাপার গোচরিভূত হইয়া থাকে, তাঁহারা ইহ বা পর জগতে তাহাদের প্রিয় জীবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবার শক্তি লাভ করিয়া বহুবিধ উপায়ে তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকেন--যাহা স্থুল দৃষ্টিসম্পন্ন এখানকার মানবের অগোচর। এই ভাবেই সেই ভোটিয়া নারী তাহার সন্তানের পক্ষে মৃত হইলেও অশেষ কল্যাণকারিণী হইয়াছিলেন। জগদীশ্বরের সৃষ্টি এই ক্রমেই রক্ষা হইতেছে।

এইবার আমার কর্ম্মক্ষেত্র পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল এবং আমাকে উহা কি বিচিত্র ক্ষেত্রে টানিয়া আনিল তাহার কথা বলিব। এ পর্য্যন্ত আমার কর্ম্ম ছিল অতি দুঃখী বা আর্ত্তজনের বা ব্যক্তিবিশেষের সাহায্য করা; ক্রমে ক্রমেই এই সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ গণ্ডীর বাহিরে যে ব্যাপার ঘটিতেছে তাহার মধ্যে আমার চৈতন্য, দৃষ্টি বা অনুভূতি প্রসারিত হইল। এই অনুভব আপন চৈতন্যে সহজেই আসিয়া উপস্থিত হইল। কেহ আমাকে আমার পদোন্নতির খবর দিয়া গেল না। নিজেই অনুভব করিতে লাগিলাম, দিকে দিকে যে সকল ব্যাপার পূর্ব্বে আমার চৈতন্যগোচর হইত না, এখন তাহা হইতে লাগিল। সে ব্যাপার অপূর্ব্ব ভাবেই ঘটিল তাহা বলিবার পূর্ব্বে সত্যই এই চমৎকার তথ্যটি জানিয়া রাখা ভাল।

আমাদের ভারতে কত কত যে প্রসিদ্ধ-অপ্রসিদ্ধ দেবমন্দির আছে তাহার হিসাব হয় না। ছোট ছোট গ্রামেও অসংখ্য দেবস্থান আছে। ছোট-বড় প্রাচীন আধুনিক বিখ্যাত কারুশিল্পের নিদর্শন নানা দেবের নানা প্রকার মন্দির তো আছেই কিন্তু সাধারণ ভারতবাসীর একথা জানা আছে কি, ঐ সকল মন্দিরে যথার্থ কোন্ দেবতা অধিষ্ঠিত? অর্থাৎ কোন্ দেবতা ঐ মন্দিরস্থ বিগ্রহ অবলম্বনে সেই মন্দিরে অবস্থিত এবং পূজা গ্রহণ করেন?

আমরা দেখিতে পাই, একজন প্রতিষ্ঠাতা একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন, বিগ্রহ বা লিঙ্গ যাহা প্রতিষ্ঠাতার অভিপ্রায়ানুসারেই স্থাপিত হইয়া থাকে। কিন্তু বিগ্রহ বা লিঙ্গ, সেটি তো ধাতু বা পাথরে প্রস্তুত, যথার্থ প্রাণহীন জড়ের পর্য্যায়েই পড়ে। এসব বিষয়, উপস্বত্ব আর পূজার নিবেদিত বস্তু ও দ্রব্যসমূহ ভোগ করিয়া থাকেন অধিকারী বা তার বংশের কেহ যাকে তিনি মনোনীত ব্যক্তি বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন। এটি তো সবাই জানেন। এখন এ সম্বন্ধে যে কথাটা সবার জানা নেই সেটা এই যে, ঐ সকল মন্দির আশ্রয় করিয়া থাকেন এক শ্রেণীর বিদেহ আত্মা বা উপদেবতা বা জীব—যারা শরীর ত্যাগ করিয়াও এই পৃথিবীতে থাকিতে চান, এখানকার সম্বন্ধ কাটাইতে পারেন না বলিয়া তাঁরা এই ভাবে থাকিতেই ভালবাসেন। স্থূল ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেটুকু ধারণা সাধন বা সৎভাব তাদের সঞ্চিত কর্ম্মকে তাদের কামনা বা ইচ্ছানুযায়ী গতি দিয়া থাকে তাহাতেই তাঁর' মন্দিরের পবিত্র আবহাওয়ার মধ্যে অবস্থান করবার যোগ্যতাও অর্জ্জন করে থাকেন, আর এই সৃষ্টি রক্ষা সম্পর্কে প্রাকৃত নিয়মের বশেই তা ঘটিয়া যায়। হিন্দুশাস্ত্রে দেবতা বলিতে প্রকৃতির অধিকারে ভিন্ন শক্তি। তার মধ্যে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব গণেশ সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি, তার পর উপদেবতার সীমা সংখ্যা নেই। সবারই পূজার রীতি নেই। আসলে যে-কোন মন্দিরে যে-কোন মূর্ত্তি বা বিগ্রহ থাকুক না কেন আসলে পূজা পান কোন বিদেহ পুণ্য আত্মা যাঁরা সংস্কার বশে নিজ নিজ ইষ্ট সাধনানুসারে এক এক বিগ্রহরূপে বিরাজ করেন—তার মধ্যে সমধর্ম্মী যাঁরা তাঁরাই সেই মন্দির মধ্যস্থিত বিগ্রহের অনুরক্ত।

আরও বিশেষ কথা এই যে, ঐ সকল সংস্কার যাদের প্রবল তাঁরা সারা ভারতে হিন্দু-সংস্কৃতির পুরানো আবহাওয়ায় মানুষ আর সেই ভাবেই রক্ষণশীল মনোভাব নিয়ে জন্মান ও বংশবৃদ্ধি করেন। তাই সর্ব্বপ্রদেশের প্রায় সকল স্থানেই দেবমন্দির নির্ম্মাণ ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার বিরাম নাই। আমাদের মন্দির মধ্যে যে দেবতা থাকেন বা জনগণের

এক শ্রেণীর সেবা গ্রহণ করেন কতক মতে তাঁরা উপদেবতার সামিল। যারা দেহত্যাগের পর অলক্ষ্যে অন্তরীক্ষে বিচরণ করেন, আবার লোক-সমাজে তাঁরা একটা কোন স্থানবিশেষ আশ্রয় করে থাকেন। তাঁদের সংস্কার-গত যে ভোগ, দেবতার উপাসনার ফলে দেবতার মতই পূজা পুষ্প চন্দন, ফুল ফল নৈবেদ্য প্রভৃতি উৎসর্গীকৃত পঞ্চ উপচার বা ষোড়শ উপচারে পূজা গ্রহণেই তাঁহাদের সুখ বা পুণ্যের ফল ভোগ। দেবতা হইয়া পূজা পাইবার প্রবৃত্তিই তাঁহাদের চরম গতি। গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অন্তর্গতজীব, আসলে অধ্যাত্ম শক্তিতে অনুন্নত যারা, তারা বিগ্রহ অথবা লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা, সেই দেবতার নানা উপচারে সেবা করাই তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা। সেই মত তারা জীবিত অবস্থায় বিগ্রহ এবং মন্দির প্রতিষ্ঠাদ্বারা পরলোকের কাজ করিয়া যান। তার পর দেহ ত্যাগ করিয়া সেই বিগ্রহ বা লিঙ্গ মূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া দেবতার পূজা গ্রহণ করিয়া স্বর্গ পুণ্যফল ইত্যাদি ভোগ করেন। এমন, অনেক দিনই চলে এই ভাবের পুণ্য ভোগ। তারপর যদি সৎ ধর্ম্মে প্রবল অনুরাগ থাকে, অধ্যাত্ম উন্নতির পথটি পাইয়া যান তবেই সে আশ্রয় ত্যাগ করিয়া উর্দ্ধমুখে গতি পাইয়া থাকেন। না হইলে সেই বিগ্রহ আঁকড়াইয়াই পড়িয়া থাকেন।

প্রকৃতির এমনই সুন্দর নিয়ম, দেহত্যাগের পর আত্মচৈতন্যের বাহ্য গতি প্রখর হইয়া যায়। কারণ স্থূল বা জড়ের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ তখন থাকিতেই পারে না; সহজেই আত্মচৈতন্যের বাহনরূপী অন্তঃকরণ নিজমার্গে গতি পাইয়া যান, কিন্তু যাদের অর্থাৎ যে জীবের জড়জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘনীভূত তারা তো সহজে চৈতন্যমার্গে যাইতে পারিবে না। তারা স্থূল কিছু আশ্রয় করিয়া বহুকাল থাকিতে বাধ্য হয়। এই গণ্ডীর মধ্যে এক শ্রেণীর অপদেবতা আছে যারা নানা ভোগতৃষায় জর্জ্জরিত, তাদের দেহ না থাকিলেও মানুষ-সমাজ ছাড়িতে চাহে না বা পারে না। বিদেহ অবস্থায় সেই সমাজেই ঘোরাফেরা করিয়া

থাকে। যে যে স্থানে তাদের ভোগ্য বস্তু ও কর্ম্মপ্রবল দেখা যাইবে, তারা সেই সেই স্থানেই আছে। অপরাপর জীবিত মানুষের ভোগের সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যক্তিগত নিজ চেতনা মিলাইয়া তাঁর নিজ ভোগটা কতক পূর্ণ করিয়া লইতে চায়। এটা বুঝিতে অত পরলোকে যাইবার দরকার নাই, এই লোকেই আমাদের আশে পাশেই আমরা দেখিতে পাই না কি, একজনকে ভোজনরত দেখিয়া অপর একজন ক্ষুধার্ত্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া সেই ভোগের অংশগ্রহণ করিতেছেন? এ যেমন স্থূল দৃষ্টির বিষয়, অন্য ইন্দ্রিয় সম্পর্কে অনেক কিছু ভোগের আস্বাদন ঐ সব বিদেহ জীব গ্রহণ করে। নরনারীর দেহের গোপন মিলন উপভোগে একশ্রেণীর প্রেতাত্মার কি ভীষণ আগ্রহ। রাস্তা ঘাটে, ঝিয়ের কোলে একটি শিশু, লাবণ্যময় মনোহর মূর্ত্তি একটি নারী বা নর একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে দেখা যায় না কি? মেয়েলী কথায় তাদের বলে ডান বা ডাইনী। তারপর হয়তো এক যুবতীর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, এসব দৃষ্টি অনুসরণ করলে একটি তীব্র ভোগস্পৃহা দেখা যায় না কি? এ যেমন স্থূল নিকৃষ্ট ভোগের বিষয়, এর অপর দিকটাও ত আছে।

এখন মন্দিরাশ্রিত দেবতার কথা লইয়াই আমার বর্ত্তমান কর্ম্মাবস্থার কথা, তাহার সহিত এক গৃহী সাধুর কথা আছে। তিনি সাকার উপাসনা করিতেন। তাঁহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে তিনি, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ অবলম্বনেই থাকিতেন। এইভাবে কিছু দিন আনন্দেই ছিলেন, নিজ অধিকারে সাত্বিক পূজারতি, ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি লইয়া, ক্রমে তিনি লক্ষ্য করিলেন, যাহারা তাঁহার উত্তরাধিকারী তাহারা বিষয়বৈভব লইয়া উন্মত্ত হইল; ক্রমে পূজাদি ক্রিয়াকর্ম্মের প্রতি অবহেলা, শেষে সব কিছু লোপ পাইবার পূর্ব্বেই তিনি এভাবে উপাসনার মধ্যে অধ্যাত্ম চেতনার অভাব বোধ করিয়াই ঐ অবলম্বন ত্যাগ করিয়া উন্নত মার্গের আশ্রয় লইলেন।

এখন একটি ব্যাপার ঘটিয়াছিল, ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে, মীরাট

অঞ্চলে, সেই কথাই বলবো। কোন এক জঙ্গলের মধ্যে একটি পুরাতন মন্দির ছিল। সেই মন্দিরে যিনি আশ্রয় লইয়াছিলেন অথবা সেই মন্দির আশ্রয় করিয়াছিলেন তিনি আর ছিলেন না। একটা কথা জেনে রাখা ভালো, যখন কোন জীব ঐ ভাবে পরকালে কোন মন্দির বা দেবস্থান আশ্রয় করিয়া থাকেন তখন মন্দিরে অবস্থাও ভাল থাকে। পূজা, অর্চ্চনা সবই ঠিক মত চলে। তারপর যখন তিনি চলিয়া যান অর্থাৎ সেই অবলম্বন ত্যাগ করেন ও নিজ অভীষ্ট মার্গে গতি লাভ করেন তখন সে মন্দির আর তৎসংক্রান্ত সকল ব্যাপারই যেন আপনাপনি শেষ হইয়া যায়। মন্দির তখন শ্রীহীন, ভূতপ্রেতের আড্ডা হয়ে পড়ে। গাছ জন্মায়, শেওলা ধরে, সংস্কারহীন ভগ্নমন্দির জঙ্গলময় হইয়া বন্য পশু পক্ষির আবাসস্থান হইয়া থাকে; সে মন্দিরের কোন আকর্ষণই থাকে না।

অনেকে হয়তো মনে করবেন যে প্রতিষ্ঠাতার বন্দোবস্ত যা-কিছু, পূজার্চ্চনার জন্য বিষয়-সম্পত্তি নষ্ট হয় বলিয়াই ঐ রকম অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটে; কিন্তু প্রকৃত তা নয়, আসল অধিষ্ঠাত্রী বা অধিষ্ঠাতার অন্তর্ধ্যানের ফলেই ঐ অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ঘটে। এইটাই ঠিক কারণ। অধিষ্ঠাতার অধ্যাত্ম প্রভাবেই ঐ দেবমন্দিরের সব কিছু পূজা পবিত্রতা রক্ষার আয়োজন ঠিক থাকে; সে প্রভাবের অভাবেই যা-কিছু সবই লোপ পায়। ফলে সে মন্দির ধ্বংসের পথে যায়। কিন্তু যতদিন একেবারে ধ্বংস না হয় ততদিন সেই মন্দির আশ্রয় করিয়া অপর কোন নিম্ন শ্রেণীর অপদেবতা বা প্রেতাত্মা আশ্রয় করিয়া থাকে। তারা ভিন্ন ভিন্ন মার্গের জীব। এখানেও সেই ব্যাপার ঘটিয়াছিল; এই মন্দির আশ্রয় করিয়াছিল এক অপদেবতার জাত। সেইখানে আশ্রয় লইয়া প্রায় সময় নিজ প্রবৃত্তির তাড়নায় গ্রামের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

এখন এখানে এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটিল। এক জোয়ান ভদ্র ঘরের ছেলে আর একটি মেয়েকে কয়েকজন দুর্বৃত্ত ধরিয়া আনিয়া একদিন লুকাইয়া রাখে। মেয়েটি গৃহস্থ ঘরের সুন্দরী বিধবা। তারা

সে রাত্রে তাহাকে ঘর হইতে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া মন্দিরে লুকাইয়া রাখে। আর ছেলেটিকে কিছু দূরে একটা গাছে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। সে রাত্রে মেয়েটির উপর আর কোন অত্যাচার হয়নি। গ্রামে সেই রাত্রেই লোকদের জানাজানি, খোঁজাখুজি চলিতেছিল,তারপর ভোর হয়ে যায়, সেইজন্য তাদের কাজের সুবিধা হয়নি। সকালে একটা লোকের পাহারায় রেখে তারা ঐ জঙ্গলের আশেপাশে গা ঢাকা হয়ে থাকে। কথা ছিল, সন্ধ্যায় ওরা সবাই এসে জুটিবে আর যা করিবার তাহা করিবে।

মন্দিরের অপদেবতাটির বড় আনন্দ, সে যা চায় তাই তার সুমুখেই রয়েছে, সেও সেখানে আছে। এ দিকে মেয়েটিকে খাইতে দিলেও সে কিছুই খাইল না, তার স্বাভাবিক মন ও বুদ্ধিগত পবিত্রতাই তার মনে সাহস দিতে ত্রুটি করে নাই। তবে মাঝে মাঝে নারী-প্রকৃতিসুলভ অসহায় ভাবটা তাকে দুর্ব্বল করিয়াও তুলিতেছিল, তাই সে কাঁদিতেও-ছিল, মনে মনে ভগবান শরণও তাকে সময় সময় সাহস যোগাইতেছিল। ছেলেটিরও তাই। তবে তাহারা দুজনে দুজনের অপরিচিত নয়, একই পিতামাতার সন্তান কিন্তু ভাইটি ভগিনীর অবস্থানের কথা জানে না ভগিনীও ভাইটির কথা জানে না।

এখন এই ব্যাপারের পিছনে আছেন ওখানকারই এক জমিদার, কিছু বৈষয়িক স্বার্থের উদ্দেশ্যে এই ব্যাপারটি তিনি ঘটাইয়াছেন। মেয়েটি বড়, ছেলেটি প্রায় বছর দুইয়ের ছোট; ভাই আর বোন, মাতৃহীন তারা। ওদের বাপের কিছু বিষয়-সম্পত্তি ছিল। বাপের একটি উপযুক্ত ভাগিনেয় সেই-ই বিষয়-আশয় দেখিত; সকল কিছুই তত্ত্বাবধান করিত। তার বয়স প্রায় চল্লিশ। বাপ যখন মারা যায়, তখন তাদের মা ছিল না, বিমাতাও তাদের ছিল না, কারণ দ্বিতীয় বার পত্নী গ্রহণ করে নাই তাহাদের বাবা। সেইজন্য প্রৌঢ় বয়স্ক পিতা তাদের একটু উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিল। আজ দুইমাস হইল বাপও

মারা যায়। দুইদিন অজ্ঞান অবস্থায় ছিল, কিছু বলিয়াও যাইতে পারে নাই, ব্যবস্থাও বিশেষ কিছুই পরিবর্ত্তিত হয় নাই। ভাগনে অর্থাৎ এদের পিসতুত ভাই এস্টেটের ম্যানেজার, এদের সরাইয়া সবটার মালিক হইতে চায়। পরে হইল এই যে, বাড়িতে ডাকাত পড়ার ঢঙ করে ছেলে ও মেয়েটিকে একেবারে সরিয়ে ফেলার ষড়যন্ত্র; লুটপাট কিছু হইল, তারপর যাহা করিবার জন্য লোক লাগানো হইয়াছিল তাহা সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন করিয়া তাহারা ঐ নিরীহ প্রাণী দুটিকে এইভাবে এখানে আনিয়া রাখিয়াছে। রটনা হইয়া গিয়াছে, বাড়িতে ডাকাত পড়িয়াছিল, তারপর লুণ্ঠিত দ্রব্যসামগ্রীর সঙ্গে অধিকারী জমিদারের পুত্র ও কন্যাকে পাওয়া যাইতেছে না। বর্ত্তমানে উদ্দেশ্য এই যে, ওদের ঐ রাত্রেই হত্যা করিয়া বনের মধ্যে একজায়গায় পুতিয়া তার উপর শিকড় সুদ্ধ একটি গাছ বসাইয়া দিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করা হবে।

ছেলেটি ষোলো, মেয়েটি আঠারো। ছেলেটিই বেশি ভীতু, সেইই বড় বেশি ভয়ে একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। আমি প্রথমেই অনুভব করি, অন্তরীক্ষ হইতে এদের কাতর প্রাণের আহ্বানই আমার সঙ্গে এখানে আসিয়াছিল।

এখানে আসিয়া দেখিলাম, আমি একলা নয়, আরও দুইজন দেবদূত এখানে আছেন, কিন্তু তাঁহারা ভিন্ন কর্ম্মে রত। যাহাতে ঐ সকল নাটের গুরু, সেই ম্যানেজার ভাগিনেয়, নিজ কর্ম্মগতিতে ঐ নিরীহ উত্তরাধিকারী দুজনের হত্যার ষড়যন্ত্রে ধরা পড়িয়া নিজের কর্ম্মফল ভোগ করে, সেই দিকেই কর্ম্ম করিতে ছিলেন। ফলে গ্রামবাসী শুভা-কাঙ্ক্ষীদের একত্র করিয়া অতি দ্রুত বাহনের সাহায্যে থানায় খবর ও সঙ্গে সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে আনাইয়া মন্দিরস্থ বনভাগের চারিদিকেই অনুসন্ধানের ব্যবস্থা হইয়াছে। এখন দেখিলাম, গ্রামবাসী সুহৃদ্বর্গের ঐকান্তিক যত্ন এবং আগ্রহে পুলিশের কৃতিত্বের ফলে তাহারা

সন্ধ্যার, এমন কি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই, ছেলে ও মেয়েটিকে বাহির করিয়া ফেলিল এবং ঐ মেয়েটির এজাহারে তাহাদের শত্রুপক্ষও বন্ধনদশায় লৌহকঙ্কণ পড়িয়া হাজতে গেল। শেষে বিচারে ন্যায় এবং অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। এইভাবে সকল কর্ম্মেই ঐ দেবদূতের কাজ। গ্রামস্থ সুহৃদ্বর্গের সাহায্যেই তাহারা দুইজনে অভীষ্ট সিদ্ধির পথ সরল করিতে পারিয়াছিল। আমার কর্ম্ম তখন অন্য দিকেই গিয়াছিল। সেই কথাই বলিতেছি।

ঐ যে দুষ্ট নারকীয় জীবটি মন্দির আশ্রয় করিয়াছিল, তাহার উপস্থিতিতে, তাহাকে দেখিতে না পাইলেও মেয়েটি যে আতঙ্কে মধ্যে মধ্যে মুহ্যমান হইয়া পড়িতেছিল সেই অবস্থা হইতে উদ্ধারের সহায়তায় ছিলাম। যখন ঐ নারকী মধ্যে মধ্যে স্থানান্তরে ঐ গ্রামমধ্যে তাহার ভোগ মিটাইতে যাইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে আমি গিয়া চাপিয়া বসিলাম মেয়েটির কাছেই। সে যখন ফিরিয়া মেয়েটির কাছে আসিল তখন আমাকে তাহার নিকটে দেখিয়াই তাহার আর অগ্রসর হইবার শক্তি রহিল না, সে দ্রুতগতি পলাইয়া গেল। যতক্ষণ না গ্রামবাসী আসিয়া মেয়েটিকে মুক্ত করিল ততক্ষণ আমি তাহার কাছেই ছিলাম।

আমি কি করিতেছিলাম,—মেয়েটির মনে সাহস যোগাইতেছিলাম, ; এ বিপদ কখনও দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। গ্রামবাসারা আসিয়া তাহাদের উদ্ধার করিবে, যেহেতু কয়েকজন বিচক্ষণ গ্রামবাসী তাহার পিতার মিত্র ছিল, তাহারাও সংবাদও পাইয়াছিল, এইবার তাহারা আসিয়া তাহাদের উদ্ধার করিবে—এই আশায় আর তাহার হৃদয় অবসন্ন বা দুঃখে অবসাদগ্রস্ত হইতে দেয় নাই।

সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই যখন কোলাহল করিতে করিতে গ্রামবাসীরা মন্দিরের কাছে আসিল তখনই আমার কর্ম্ম শেষ। মেয়ে ও ছেলেটি উদ্ধারের পর—ঐ প্রেতমূর্ত্তিকে লইয়া পড়িলাম। এই আশ্রয়চ্যুত হইলেই তাহার গতি হইবে, নারকীয়—পরিস্থিতির ভিতর হইতে

উদ্ধার পাইলেই তাহার চৈতন্যের স্ফুরণ অবশ্যম্ভাবী—এ কথা সে জানিত না, আমরা জানিতাম। তাই ঐ ধরনের কোন বিদেহ মলিন-জীব দেখিলেই আমরা তাহার বাসা ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টাই করি। কারণ আশ্রয় ভাঙ্গিবার পরই তাহাদের জড়তা কাটে, এ কথা তাহারা জানে না, তাই ঐ বাসা আঁকড়াইয়া তাহারা পড়িয়া থাকে।

অন্তরীক্ষের এই মহান কর্ম্মক্ষেত্রের সঙ্গে মানব-সমাজের প্রত্যক্ষ পরিচয় তো নাইই, কিন্তু কতভাবেই না মানব-সমাজ উপকৃত হয় ভাবিলে বিস্ময় লাগে। এই জগতে মানব কল্পনা করিয়া পরলোকের কথা কতমতেই আলোচনা করে। কিন্তু যথার্থ পরলোকের যা-কিছু এই অন্তরীক্ষের—জলাধারের অন্তরীক্ষের সাথে মিশাইয়া আছে। এ সৌরজগতের মধ্যে এই পৃথিবীর অন্তরীক্ষের প্রসারতা কম নয়, মানব-মনের কাল্পনিক গণনার ধারাও ইহার অন্ত পায় না। অথচ এই মানব সমাজের সঙ্গে তাহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

# পরিশিষ্ট

মানুষের সঙ্গে মানুষের যে ভাবে কথাবার্ত্তা ও ব্যবহার দ্বারা পরিচয় হয়, বিদেহ জীবেরও তেমনি একরকম ভাবে ভাবে পরিচয় হয়, এটা আগেই কথা-প্রসঙ্গে বলেছি। স্থূল বাক্যের প্রাণ হইল ভাব, —এ জগতে ভাবের স্থান অতি উচ্চে। মানুষ-সমাজে স্থূল শরীর আশ্রয় করিয়াই যত কিছু ক্রিয়াকর্ম্ম চলিতেছে। এই কারণে, স্বভাবটা তার যত কিছু স্থূল বস্তু অবলম্বন করিয়াই চলে, স্থূলের উপরেই তার আসক্তি বেশি। শব্দ বা বাক্য সেটি ত স্থূল, দেহও স্থূল। দেহ ও ইন্দ্রিয় সম্পর্কে যা-কিছু ক্রিয়া উৎপন্ন করে, তাহাও স্থূল। —মানুষে মানুষে ব্যবহারে, একে অপরের স্থূলরূপ বা তার কথা যা শব্দ হইয়া বাহির হয় সেগুলি সহজেই ধরিতে পারে,—কিন্তু রূপের প্রাণ যেটি, বা শব্দের মধ্যে যে ভাবময় রূপ রহিয়াছে তাহার কতক অর্থবোধ করিলেও আসল তত্ত্বটি দেখিতে পায় না। মানুষের মধ্যে যারা উন্নত, ভাবরাজ্যে তাহাদের যে গতাগতি, অনুন্নত মানুষের তা নাই, কাজেই ভাবরাজ্যের কথা তাহাদের অজ্ঞাত বলিলেই হয়।

কিন্তু এই সব জড়, স্থূল রাজ্যের ব্যবহার এবং সূক্ষ্ম ভাবরাজ্যের ব্যবহার, এই দুইয়ের মধ্যে একটি সরল সূত্র আছে যাহার দ্বারা একের সঙ্গে অপরের ব্যবহার চলিতেছে; সেটি হইল মানুষের বুদ্ধি বা যুক্তি। এই যুক্তি আশ্রয় করিয়াই মানুষ নিজেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্তারূপে অনুভব করে এবং নিজেকে অন্য সবার তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করে। তবে যেখানে কোন ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিবিশেষের বুদ্ধি, জ্ঞান বা যুক্তির বৈশিষ্ট্য দেখিয়া মুগ্ধ হয় সেইখানেই তাহার অহং স্তম্ভিত এবং শেষে ঐ জ্ঞানী ব্যক্তির শরণাগতি ব্যতীত আর উপায় থাকে না। এই

ভাবেই মানুষ-সমাজের নিম্ন স্তর হইতে উচ্চ স্তরের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষার কাজটি চলিতেছে।

এখন এটা স্পষ্টই দেখা যায়, মানুষ নিজ সমাজে বেশ কাজকর্ম্ম করিয়া পিতামাতা, ভাইভগিনী, স্ত্রীপুত্র বন্ধুবান্ধব লইয়া বেশ একপ্রকার সহজ বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া নানাভাবেই চলিতেছে, কিন্তু এক জায়গায় আসিয়া তাহার বুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়া গেল ; এ জায়গায় সবারই বুদ্ধি যুক্তি স্তম্ভিত হইয়াই থাকে, কারণ মানুষ যতই উন্নত হোক না কেন, এখানে উন্নত-অবনত সবারই একই গতি। এখানে সবাই একই সমস্যায় ডুবিয়া যায়, স্তব্ধ হয়,—কেহ কাহাকেও সহায়তা করিতে পারে না। কারণ এ সমস্যা, রহস্যময় অবস্থার সমাধান মানুষের দ্বারা সম্ভব নয় ; সে অবস্থাটি কি ? মৃত্যু। এই মৃত্যুই মানুষ-সমাজের পরম রহস্য হইয়া আছে। শুধু মৃত্যু নয়, জন্মও ঠিক অতটাই রহস্যাবৃত, অতটাই বিস্ময়কর, অতটাই গভীর, মানুষের বুদ্ধির অতীত বিষয়। কিন্তু ঐ জন্মের উপলক্ষ্য হইয়া একটা এমনই সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্য অতীব সুখের ব্যবহার আছে যাহাতে সাধারণ জীবের পক্ষে ঐ রহস্যের পশ্চাতে ধাবন বা অনুসন্ধান প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া যায়। কাজেই বহির্মুখী জীবের জন্ম উপলক্ষ্য করিয়া যে রহস্যের মধ্যে তাহার এই ধরার মাটিতে আবির্ভাব, আবার কালের মধ্যে খানিক হাত-পা নাড়িয়া মন বুদ্ধি লইয়া খেলা করিয়া এই মাটি হইতে তাহার তীরোভাবও তেমনি অমীমাংসিত এবং বিস্ময়কর ব্যাপার হইয়াই রহিয়াছে। অবশ্য ইহা লইয়া উন্নত পর্য্যায়ের যারা তাদের শুধুই কল্পনা নয়, সেই কল্পনার সঙ্গে যুক্তিও আছে। তাহা যুক্তি-যুক্ত কল্পনা বলিয়াই প্রচলিত। এখন সেই সকল অনুসন্ধানের ফলরূপে সমাজের একস্তরের অনুসন্ধিৎসু জীবের মধ্যে কাল্পনিক অবলম্বন হইয়াই আছে। তাঁহাদের এক শ্রেণীর মত এই যে, জীব জলৌকার মত একটি গর্ভ আশ্রয় বা অবলম্বন করিয়া তবে দেহ পরিত্যাগ করে

আমরা জানি, ঐ সকল তত্ত্বজ্ঞদের মতের মধ্যে সত্য আছে, কারণ একশ্রেণীর যথার্থ জ্ঞান বা মুক্তির জন্য সর্ব্বস্বত্যাগী জীবের পক্ষে তপস্যাপ্রভাবে আদ্যা প্রকৃতির কৃপায় যোগবলে সৃষ্টিতত্ত্বের কতক রহস্যের সন্ধান পাইয়া থাকেন। সেই স্তরের একশ্রেণীর মত, দেহ ত্যাগের পর জীবের ঐ জলৌকাবৎ দেহ ত্যাগ ও গর্ভ আশ্রয়ের ব্যাপার ঘটে। আমরা জানি সাধারণত সকল জীবেরই ঐ ভাবের জন্ম মৃত্যু ঘটে না, ঐ ভাবের জন্ম মৃত্যু ও পুনর্জন্ম শিশু বা বালকদের হইতে পারে। কিন্তু পূর্ণ বয়স্ক, যারা জীবন ভোগ করিয়া জন্ম হইতে দীর্ঘ কতক কাল এ সংসারে কর্ম্ম এবং ভোগাদি ব্যাপারে নিযুক্ত, জীবনে যাহাদের স্বার্থপ্রণোদিত জটিল কর্ম্মাদি অনুষ্ঠিত, তাহাদের তো ঐ ভাবে দেহত্যাগ ও পুনর্জন্ম হইতেই পারে না। তাহাদের অনেকেরই পুনর্জন্মের যোগাযোগই থাকে না। অনেকের গীতার কথামত ধারণা যে মৃত্যু মাত্রেই জন্মান্তর গ্রহণ ঘটিয়া থাকে। জন্মান্তর গ্রহণের পথ মোটেই ঐ ভাবের নয়। উচ্চ স্তরের জ্ঞান ও শক্তি, জাগ্রত বিবেকবুদ্ধিবিশিষ্ট জীব ব্যতীত সাধারণ জীবের জন্মগ্রহণের অধিকার থাকে না। দেহত্যাগের কালে ইচ্ছা, প্রবল পুনর্জ্জন্মের লোভ এটা সকল জীবেরই থাকে কিন্তু উহা থাকিলেই কি তা সম্ভব? এখানে প্রকৃতি জননী বড়ই হিসাব করিয়া চলেন। যদি ইচ্ছামত যত বিগত দেহ জীব আত্মা পুনরায় দেহ বা জন্ম গ্রহণ করিবার অধিকার পাইত তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে স্থান সঙ্কুলান হইত না। মানব-শরীর ধারণের যোগ্যতা অর্জ্জন এবং প্রকৃতি রানীর তাহাতে সম্মতি বড় সহজ বিষয় নয়। স্রষ্টার বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকিলে কেহ এখানে আসিয়া কর্ম্ম করিতে পারে না। সেই জন্যই ত্যক্ত দেহ মানুষ মৃত্যুতে অথবা দেহ ত্যাগের পর বেশি দুঃখ এইভাবেই পায় যে, সমস্ত জীবনটা তাহার বৃথাই গিয়াছে; যেরূপ কর্ম্ম তাহার করা উচিত ছিল, যে কর্ম্ম করিলে সে এখন শান্তি পাইত সে

ভাবে সে সব কর্ম্ম করাই হয় নাই। প্রবৃত্তির বশেই সে চলিয়াছিল, মনে স্বার্থও দ্বেষের গ্লানি পুষিয়া অপর শান্ত আত্মা যাঁরা তাহাদের পীড়িত করিয়াছে। এখন পুনরায় যদি একবার সুযোগ পায় তো এবার আসিয়া মানবজন্ম সার্থক করিবে। কিন্তু তখন ব্যাকুল হইলেও সে সুযোগ তাহার আসে না। আমরা এখানে, এই অন্তরীক্ষে দেখিয়াছি, বহুতর বিদেহ জীব ব্যাকুল হইয়া কেবল আর একবার জন্মলাভের জন্য বিস্তর অনুতাপ ভোগ করিতেছে। সে তাপ এমনই মর্ম্মন্তুদ যে, ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। সে তীব্র অনুশোচনায় তাহার কাতর অবস্থা দেখিলে আমাদের পর্য্যন্ত টলাইয়া দেয়। কিন্তু আমাদের হাত-পা বাঁধা, আমাদের অধিকারের সীমা আছে। আমরা তাহাদের কি করিতে পারি? বড় জোর, নানা সৎভাব প্রয়োগ করিয়া শান্ত করিয়া থাকি। তারপর তাহাদের কাল পূর্ণ হইলে প্রেতলোক ও পিতৃলোক হইতে যাহাতে গতি তাহাদের উচ্চতর হয় সেদিকে লক্ষ্য স্থির করিতে সাহায্য করিয়া থাকি। অবান্তর হইলেও বলিলাম, কারণ, এসব বিষয় একটু মনের মধ্যে আলোচনা বা বুদ্ধির গতি নির্দ্ধারণপূর্ব্বক নিজ জীবন বিশ্লেষণ তো একজনের সহায়তা করিতে পারে বলিয়াই মনে হয়, এগুলি জানিয়া রাখাই ভালো।

এখন এই যে মন্দির বা কোন দেবস্থান আশ্রয় করিয়া আছেন একশ্রেণীর বিদেহ জীবের কথা, তাঁহাদের সংস্কারানুসারে যে ভাবের স্থান অস্তিত্বের পক্ষে সুখদ বা প্রয়োজনীয় এবং শান্তিপ্রদ তাঁহারা জীবিতাবস্থার তপস্যা প্রভাবে উহা সৃষ্টি এবং দেহত্যাগের পর ঐ সকল পবিত্র স্থান অবলম্বন করিয়াই সেই সমাজের সমধর্ম্মী, সমভাবাপন্ন সমবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পূজার্চ্চনা গ্রহণ করিয়া কালযাপন করিয়া থাকেন, ঐ প্রসঙ্গ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহাতেই সুখ বা পুণ্য এই ধারণাই তাহাদের থাকে। আবার অনেক ঐ শ্রেণীর উপদেবতা আছেন যারা রোগমুক্তির সহায়তা করিতে সচেষ্ট। পীড়িত ব্যক্তিগণের দুঃখ

তাঁহারা দেখিতে পারেন না, তাই নানাপ্রকার রোগ মুক্তির সহায়তায় তাঁহাদের সচেষ্ট দেখা যায়। অনেক প্রকার ঔষধ নানা ভাবেই বলিয়া দেন। অনেক সাধু সন্ন্যাসী ইহার মধ্যে আছেন, তাঁহাদের প্রবল বিশ্বাস, মানুষকে রোগযন্ত্রণামুক্ত করা ঈশ্বর-অভিপ্রেত কর্ম্ম এবং এই কর্ম্মের দ্বারাই তাঁহারা ঈশ্বর তুল্য পূজ্য হইবেন।

ঐ ভাবেই মন্দিরালয়ে এক শ্রেণীর সাধু বাস করিয়া থাকেন। তাহাদের মধ্যে কাহারও বা আত্মচৈতন্যের প্রসার যতটা হইয়ছিল কর্ম্মক্ষয় ততটা হয় নাই! এই লোকেও কর্ম্মব্যতীত থাকিবার জো নাই। এমন সন্ন্যাসী বা সাধু এই সংসারে অতি অল্পই আছেন যাঁহারা ত্রিবিধ কর্ম্মক্ষয় করিয়া পূর্ণ ভাবেই আত্মারাম হইয়া এখান হইতে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। এই ভাবের মুক্ত বিদেহ যাঁরা, তাঁদের দেহত্যাগ একটি অপূর্ব্ব ব্যাপার। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে দেহত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য রশ্মি অবলম্বন পূর্ব্বক এমন অবস্থায় চলিয়া যান, যাহার কথা জগদ্বাসী সাধারণ মানবের তো ধারণাই নাই, এমন কি, এখানে তাঁহাদের পরমগতির কথা অন্তরীক্ষবাসী আমরাও জানি না। তবে এই টুকু,— তাঁহাদের জ্যোতির্ম্ময় অপরূপ পবিত্র আত্মস্বরূপের গতির পরশ লাগিয়া আমাদের সবার অস্তিত্বের মাঝে আনন্দময় শিহরণ খেলিয়া উর্দ্ধপানে মিলাইয়া যায়, সারা ক্ষেত্র ব্যাপিয়া সে স্পন্দন আমাদের অস্তিত্ব সার্থক করিয়া তুলে যাহার স্বরূপ বুঝানো সম্ভব নয়, মাত্র আত্মায় অনুভবেরই বিষয়। এইটুকুই আমাদের বোধগম্য। বাকী যে সব কর্ম্মাধীন সাধু, তাঁহাদের সংসার-সমাজে সাধু বলিয়া যতই কেন না প্রতিষ্ঠা থাকে, যতই ভক্তবৃন্দে পরিবৃত হইয়া সংসার-সমাজে থাকুন না, তাঁহাদের গতি সম্পূর্ণরূপে সংস্কারমুক্ত হইতে না পারিয়া আপনাপন জ্ঞান এবং ভোগ-সংস্কার বশে কোন না কোন কর্ম্ম আশ্রয় করিয়াই ইহ ও পর দুই লোকেই থাকেন। বিশেষ, এখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠালোলুপ যে শ্রেণী সাধু দেখা যায়, তাঁহাদের পরলোকগতি ঐ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত দেবালয়

মধ্যেই কোন না কোন সৎকর্ম্ম আশ্রয় করিয়াই থাকিতে হয়। ইহার মোহ কাটাইতে বহু কাল যায়। কর্ম্ম সৎ হোক বা অসৎ হোক উহা একটি বন্ধন, পাশ এবং মোহ মাত্র একথা মোক্ষমার্গের সবাই জানেন। কর্ম্ম-মোহ সম্পূর্ণ না কাটিলে মুক্ত বা সিদ্ধ হওয়া যায় না। এটি মনে রাখিয়াই সকল কিছু পারমার্থিক জগতের কথা আলোচনা করিতে হইবে। যাহা হউক, দেহত্যাগের পরও সাধারণত কর্ম্ম ও ভোগ থাকে; নানা প্রকার বিপন্ন অবস্থায় জীবের ত্রিবিধ দুঃখমোচন, বুদ্ধিবিপর্য্যয়-ঘটিত দুঃখ দূর, কাহারও বা নানাকারণে জীবন গতি-বিপর্য্যয়ের দুঃখ, নানা ভাবের অজ্ঞানকৃত দুঃখ হইতে মুক্তি, সৎকর্ম্মের বিঘ্ন অপসারণে সহায়তা, এই ভাবে নানা বিষয়ে কর্ম্মধারা সূক্ষ্ম ভাবে চলিতে থাকে, উচ্চস্তরের অন্তরীক্ষবাসীদের কথাই বলিতেছি।

আশ্চর্য্য এই পরলোকের কথা।

* * *

এইবার নিখিলবন্ধু চুপ করিল,—দেখিলাম, তাহার মুখখানি অতীব গম্ভীর সুন্দর, প্রফুল্ল এবং উজ্জ্বল, যেন এক অদ্ভুত দীপ্তিতে পূর্ণ, যেমনটি প্রায়শ কাহারও মুখে দেখা যায় না। সে যেন আলাদা একটি মানুষ, এ লোকের নয়, আমার অপরিচিত, আবার যেন পরিচিতও বটে। একটি স্নিগ্ধ হাসির ভাব তাহার চক্ষে, অথচ মুখে হাসিতেছে না। কতক্ষণ ঐ ভাবেই সে আমার পানে চাহিয়া রহিল। নিঃসঙ্কোচে ঐরূপভাবে ঠায় চাহিয়া থাকা একজনের মুখের পানে, সে ঐ ব্যক্তিই পারে। তাহার সেই দেখার মধ্যে যেন আরও কিছু ছিল। সে দৃষ্টিতে একজনের মনে যে রহস্যময় অপূর্ব্ব একটি ভাব জাগায়, বিস্ময়ে অবাক হওয়া ব্যতীত তাহা বর্ণনার আর কোন ভাষা নাই।

খানিক পরে, যখন তাহার দৃষ্টির প্রভাব অনেকটাই স্তিমিত হইয়া আমার স্বাভাবিক ভাব, অর্থাৎ নিখিলের সঙ্গে আমার সহজ সম্বন্ধবোধ

প্রায় ফিরিয়া আসিয়াছে, এমনই মুহূর্ত্তে হঠাৎ যেন এই কথাটা আমার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল :

থামলে যে ? শেষ হয়ে গেল নাকি তোমার কথা ? শুনিয়া নিখিল আবার এক রকমের একটু হাসিল,—মুচকি হাসির ভাবটি,—যেন আমার কথাটি তাহার বিশ্বাস হইল না। তাহাতে আমি একটু অপ্রতিভ বোধ করিলাম। যেই সে দেখিল তাহার সেই মিলানো হাসির প্রভাবে আমি অপ্রতিভ হইয়াছি, তৎক্ষণাৎ সে বলিল,—এর পর আরও শুনতে চাও ? আমার তো মনে হয় ওটা ঠিক তোমার ভিতরের কথা নয়।

সত্য সত্যই এইবার যেন পূর্ণ অপ্রতিভ হইলাম, তাই চুপটি করিয়াই আছি দেখিয়া সে অতীব কোমল কণ্ঠেই বলিল,—দোষ নিও না ভাই, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্য বল,—তোমার কি আর একটুও ধৈর্য্য আছে,—তুমি যে আরও শুনতে চাইচো ?

এখন আত্মরক্ষার্থে সত্যই বলিলাম,—আচ্ছা, তুমি সত্য বল তো তোমার আজকার কথা আরম্ভ থেকে শেষ, যখন নিজেই কথা বন্ধ করেছ, তখন পর্য্যন্ত আমায় তিল মাত্র অমনোযোগী দেখেছ কি-না ? তুমিই বলো।

ভাই,—বলিয়া নিখিলবন্ধু একটু যেন কিছু ভাবিয়া লইল, তারপর বলিল,—সত্যই বলচি, আমি ঠিক লক্ষ্য করিনি। তবে এখন তোমার কথায় মনে হচ্চে যেন তুমি একবারও নস্য নাওনি যদিও দেখচি এখনও তোমার নস্য শিশিটি হাতেই ধরা আছে। বোধ হয় শুনছিলে। তা বেশ, ভাই,—বলিতে বলিতে ধীরে ধীরে সে উঠিল এবং এক পা এক পা চলিতে লাগিল,—যেন দ্বারপথ অতিক্রম করিয়া এখনই চলিয়া যাইবে, দেখিয়া আমিও উঠিলাম।

একটু দাঁড়াও না ভাই, আমার কথা আছে তোমার সঙ্গে।

আর একদিন হবে,—বলিয়াই সে সোজা চলিয়া পথের উপর গিয়াই দাঁড়াইল। আবার সেই রহস্য মা মিলানো হাসির ভাবটি মুখে লাগিয়া আছে দেখা গেল

তারপর আমার প্রতি একেবারেই বিমুখ নিখিল হইল।

পথটা সোজা সমুদ্রের দিকেই গিয়াছে।

